এশিয়ার ছেলেমেয়ে



আশুতোষ লাইব্রেরী

এশিয়ার ছেলেমেয়ে

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত
[কলিকাতা গেজেট, ২৩শে মে, ১৯৪০]

ভীমাপদ ঘোষ, এম. এ.

মূল্য চৌদ্দ আনা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্‌স্ লিমিটেড্

স্বত্বাধিকারী—**আশুতোষ লাইব্রেরী**

৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ

১৬, ফরাসগঞ্জ রোড, ঢাকা

দশম সংস্করণ

(পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত)

১৩৬০

মুদ্রাকর

শ্রীপরেশনাথ ব্যানার্জি

শ্রীনারসিংহ প্রেস

৫, বংকিম চাটার্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

উৎসর্গ-পত্র

—*:*:*—

পরম পূজনীয়া

রাণী শ্রীযুক্তা শতরূপা সিংহ

দিদি ঠাকুরাণীর করকমলে

প্রণত

শ্রীভীমাপদ

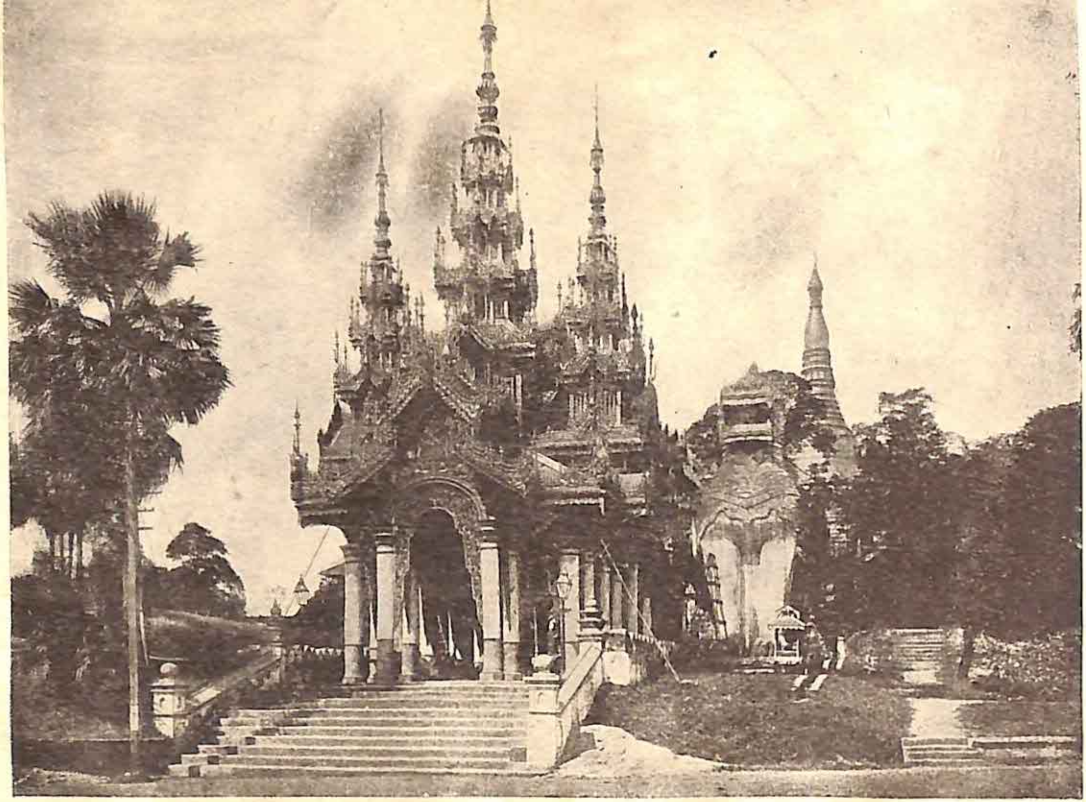
ভূমিকা

এশিয়ার কয়েকটি দেশ ও তাহার ছেলেমেয়ের কথা বাঙলার ছেলেমেয়েদের হাতে অর্পিত হইল। এই পুস্তকের কতিপয় প্রবন্ধ 'শিশুসাথী', 'মুকুল' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া ছেলেমেয়েরা শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ১৩৪২ সন	বিনীত গ্রন্থকার

সূচী



ব্রহ্মদেশের প্যাগোডা

এশিয়ার ছেলেমেয়ে

জাপান ও তাহার ছেলেমেয়ে

এশিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে জাপান নামক ক্ষুদ্র দেশ কতকগুলি দ্বীপ লইয়া গঠিত। পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বলিয়া অনেকে ইহাকে "Land of the rising sun" বা **প্রভাত সূর্য্যের দেশ** বলেন। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও এই দেশ খুব উন্নত। জাপানের লোকসংখ্যা মাত্র ছয় কোটি। এই অল্প সংখ্যক লোক লইয়া জাপান অর্দ্ধ শতাব্দীর চেষ্টায় যে উন্নতি করিয়াছিল, তাহা বাস্তবিক অদ্ভুত। গত মহাযুদ্ধে হারিয়া গিয়া জাপানীরা বড় কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু জাপানীরা যেমন কঠোর পরিশ্রমী, তাহাতে তাহারা আবার শীঘ্রই বড় হইয়া উঠিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। জাপানীদের কাছে আমাদের অনেক শিখিবার আছে।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জাপানীদের সহিত বিদেশীয়দের কোন সংশ্রব ছিল না; তাহারা বিদেশীমাত্রকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিত। এই বৎসর কমোডোর পেরী নামক একজন আমেরিকাবাসী জাপানের বন্দরগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার নিমিত্ত কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া তথায় গমন করেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয়, এবং এই সময় হইতে জাপানের উন্নতি হইতে থাকে। জাপান কূপমণ্ডুকতা ছাড়িয়া নূতন ভাবে শিক্ষিত হয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সমৃদ্ধিশালী দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে থাকে। কেবল তাহাই নহে, রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান একটি প্রথম শ্রেণীর সামরিক জাতি বলিয়া গণ্য হয়। জাপানের উন্নতির কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দিতেছি।

জাপানের অধিকাংশ স্থান পর্ব্বতময় বলিয়া ইহার অধিকাংশ স্থানেই কোনও ফসল হয় না। জাপানে আবাদী জমির পরিমাণ সমগ্র বাঙলার আবাদী জমির এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। এই দেশে অনাবাদী বা পতিত জমি নাই বলিলেই হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানীরাও পূর্ব্বে কৃষিকার্য্য ও বয়ন-শিল্পাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু দেশ তখন দরিদ্র ছিল। কৃষির দ্বারা যথেষ্ট আয় হইত না। সাধারণ জাপানী কৃষকের জমির পরিমাণ তিন হইতে আট বিঘা মাত্র।

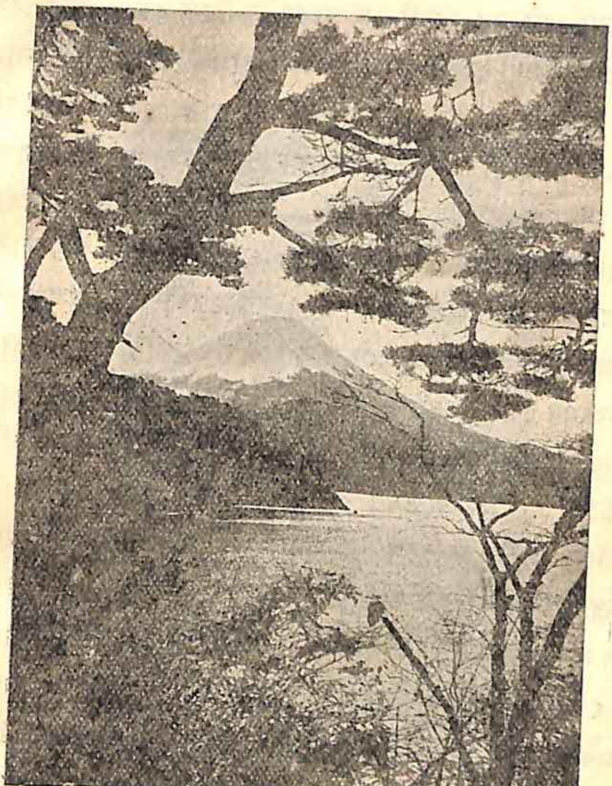
ঐরূপ সামান্য জমিতেই উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিয়া ও কৃষি সম্বন্ধে উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিয়া জাপানী কৃষকের আয় বহুগুণ বাড়িয়া যায়। কৃষি ব্যতীত গুটীপোকা বা রেশমকীট পালন ও নানা প্রকার কুটীর-শিল্প দ্বারা জাপানী কৃষক বহু অর্থ উপায় করিতে থাকে। জাপানের রেশমি সূতা ও সুদৃশ্য রেশমি বস্ত্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতে থাকে। ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় বাঙলা কেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেরও রেশম-শিল্পের ক্রমশঃ অবনতি ঘটে। জমির পরিমাণ অল্প হইলেও জাপানে ধান্য, যব, গম, চা, আলু, কফি, শশা, সীম, তরমুজ, কমলালেবু, আঙুর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

ইংরেজ আমলে আগে অখণ্ড বাঙলায় প্রায় ৩৮ কোটি টাকার কার্পাসবস্ত্রের আবশ্যক হইত। গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৮৷২৯ বৎসর স্বদেশী আন্দোলন চালাইয়া বাঙালী মাত্র দেড় কোটি টাকার কাপড় প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়! বোম্বাই, আহমদাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি শহরের কাপড়ের কল হইতে বাঙলায় প্রায় ২০ কোটি টাকার কাপড় আসিত। বাকি কাপড় বিলাত বা জাপান হইতে আমদানি হইত। জাপানে কিন্তু তূলা জন্মায় না। এদেশের তূলা জাপানে চালান হইত। পরে উহা হইতে সূতা বা কাপড় প্রস্তুত করিয়া ভারতের বাজারে সস্তা দরে বিক্রয় করা হইত।

কাপড় ছাড়া অনেক টাকার দিয়াশলাই, কাচের দ্রব্য, খেলনা, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি জাপান হইতে ভারতে আমদানি হইত। স্বদেশ-প্রেম, সার্ব্বজনীন শিক্ষা, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণা, শ্রমসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও সহযোগিতাদি দ্বারা জাপানীরা অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ উন্নতি লাভ করে। কিন্তু গত মহাযুদ্ধে হারিয়া চতুর্দ্দিকেই জাপানের বিষম ক্ষতি হয়।

জাপানীরা মঙ্গোলীয় জাতি। সাধারণ বাঙালীর মত ইহারা আকারে ছোট, কিন্তু ইহাদের নাক চেপ্টা। ধর্ম্মবিষয়ে কোনও প্রকার গোঁড়ামি ও দলাদলি জাপানে নাই। একই পরিবারের মধ্যে হয়ত পিতা সিন্তোধর্ম্ম মানে, পুত্র বৌদ্ধ ও কন্যা খৃষ্টান; কিন্তু গৃহের কাজকর্ম্ম দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সিন্তোধর্ম্মের মূলনীতি—প্রকৃতি ও পূর্ব্বপুরুষের পূজা। জাপানের সম্রাট্ ও সরকার এই ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বহু লোক এই ধর্ম্ম মানিত। কিন্তু বৌদ্ধের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। খৃষ্টানদিগের জন্য স্থানে স্থানে প্রটেষ্টাণ্ট্, রোমান-ক্যাথলিক ও গ্রীক সম্প্রদায়ের গির্জ্জা আছে। সাধারণ লোকে নানাপ্রকার দেব-দেবী, কবচ ও তুক্‌তাকে বিশ্বাস করে। আমাদের দেশের তান্ত্রিকেরা শিবা বা শৃগালের পূজা ও ভোগ দেন। জাপানেও এইরূপ জীবন্ত শৃগাল ও প্রস্তরনির্ম্মিত শৃগাল-মূর্ত্তির পূজা হয়। ইহা ছাড়া অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা

জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। হিমালয় পর্ব্বতকে



ফুজিয়ামা

আমরা যে চক্ষে দেখি, জাপানীরা ফুজিয়ামা বা ফুজিসান পর্ব্বতকেও সেই চক্ষে দেখে।

বিদেশ হইতে জাপানে যাইতে হইলে জাহাজে চড়িয়া জাপানের কোনও বন্দরে অবতরণ করিতে হয় ; পরে রেল, মোটর, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতিতে দেশের মধ্যে নানা স্থানে যাওয়া যায়। জাপানের প্রত্যেক রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশনেই অসংখ্য রিক্সা বা মানুষে টানা গাড়ী থাকে। রিক্সাওয়ালারা বেশ দৌড়াইতে পারে। প্রায় প্রত্যেক শহরেই বিদেশীয়দের থাকিবার জন্য দেশীয় ও ইউরোপীয় প্রথায় অনেক হোটেল আছে। জাপানীরা এখন বিদেশী-দিগকে ঘৃণা করে না,—বরং গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যাহাতে প্রতিবৎসর দেশ-বিদেশ হইতে ভ্রমণকারীর দল জাপানে গমন করেন, তাহার জন্য জাপান সরকার বিজ্ঞাপনাদিতে বাৎসরিক বহু টাকা ব্যয় করিতেন। কারণ বিদেশী ভ্রমণকারীর দল জাপানে গমন করিলে জাপান সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ইহার পণ্যদ্রব্যাদি সম্বন্ধে, তাহাদিগের জ্ঞান বাড়ে এবং তাহার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে জাপানী দ্রব্যের কাট্‌তি বাড়িয়া যায়।

পোষাক-পরিচ্ছদে জাপানীরা আদৌ আড়ম্বরপ্রিয় নহে। আজকাল পুরুষেরা অনেক ক্ষেত্রে সাহেবদের মত কোট ও পায়জামা ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা লুঙ্গী এবং স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই কিমোনো নামক ঢিলা জামা ব্যবহার করে। ইহারা প্রত্যহ স্নান করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে।

জাপানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় বলিয়া কাগজ, কাঠ প্রভৃতি

দিয়া ঘর প্রস্তুত হয়। পাকা ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণের খরচ অপেক্ষা এই সকল ঘর নির্ম্মাণের খরচ অনেক কম। ঘরগুলি সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। একখানি বড় ঘরের মধ্যে অনাবশ্যক



একটি জাপানী মেয়ে

কতকগুলি দেওয়াল না দিয়া অনেক সময় কাগজের বা কাঠের 'পার্টিসন' বা পর্দ্দা দিয়া আবশ্যকমত ছোট ছোট ঘর করিয়া

লওয়া হয়। এইগুলি দেখিতে অতি সুন্দর এবং সহজে সরান বা নড়ান যায়।

জাপানীরা যেরূপ সৌন্দর্য্যের উপাসক, পৃথিবীর আর কোনও জাতি সেরূপ নহে। ইহারা একসঙ্গে অনেকগুলি ছবি ঘরে টাঙায় না। একটি ঘরে কেবল একটিমাত্র ছবি টাঙান থাকে। কারণ ইহারা বলে যে, এককালীন অনেকগুলি ছবি একস্থানে টাঙান থাকিলে ছবি ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা যায় না ও ছবির সৌন্দর্য্য উত্তমরূপে উপভোগ করিতে পারা যায় না। একটি ছবি একস্থানে অনেকদিন থাকিলে একঘেয়ে ভাব উপস্থিত হয়। এই জন্য মধ্যে মধ্যে ছবিগুলি বদলাইয়া দেওয়া হয়।

জাপানীদের আসবাবপত্র কম। গৃহের মধ্যে টেবিল, চেয়ার, খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি থাকে না। আসবাবের মধ্যে একটি টুল ও দুই-একটি ফুলদানি থাকে, কারণ জাপানীরা ফুল খুব ভালবাসে। ঘরের মেঝেয় একটি সপ বা মাদুর পাতা থাকে। শুইবার সময় ইহার উপর বিছানা বা গদি পাতিয়া এবং কাষ্ঠের বালিসে মাথা দিয়া শয়ন করে। আজকাল অবস্থাপন্ন জাপানীরা ইউরোপীয় প্রথায় টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি ব্যবহার করিতেছেন। বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা অতিথি আসিলে জাপানীরা মাথা নত করিয়া অভিবাদন করে। বসিবার সময় আমাদের মত আসন

করিয়া না বসিয়া পা দুইটি পিছনের দিকে মুড়িয়া হাঁটু গাড়িয়া বসে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের নবাব, আমীর, ওমরাহ প্রভৃতি ধনী মুসলমানদিগের দরবারে লোক এইরূপে বসিত। গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জুতা বা খড়ম গৃহের বাহিরে রাখিয়া যায়।

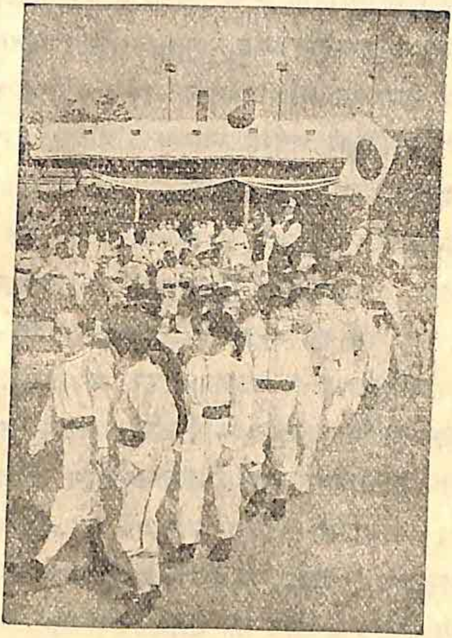
আহারাদি বিষয়েও জাপানীরা অতিশয় মিতাচারী। ইহারা ভাত, তরকারী, চাউলের পিঠা, 'সয়বীন' নামক এক প্রকার সীমের বীজের পিঠা ও মাছ খায়। ইহারা কখনও কখনও কাঁচা মাছ খায়। জাপানীরা খাইবার সময় কাঁটা চামচ প্রভৃতির ব্যবহার করে না, কিন্তু পেন্সিলের মত দুইটি কাঠির সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য মুখে তুলিয়া লয়। কাঁচা চায়ের পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া, উহার সহিত দুধ বা চিনি না মিশাইয়া পান করে। কেহ দেখা করিতে আসিলে তাহাকে চা দিয়া অভ্যর্থনা করে। জাপানীদের চায়ের পেয়ালা বা কাপগুলি প্রায়ই হাতল-বিহীন। ইহারা কোনও কোনও সময় দুই বা তিন ঘণ্টা ধরিয়া চা পান করে ও গল্প করে। গল্প করিতে করিতে এক এক সময় এত তাড়াতাড়ি চা পান করে যে, মনে হয় যে লোকটির বিশেষ কোন জরুরি কাজ আছে, এইবার চা পান করিয়াই উঠিয়া পড়িবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, সেই লোকটি "কেচে গণ্ডুষ করিল" অর্থাৎ আবার গরম চা ঢালিয়া পান করিতে আরম্ভ করিল ও গল্প

জুড়িয়া দিল। চা তৈয়ারী, চা ঢালা ও চা পরিবেষণ করা বিদ্যায় জাপানী গৃহিণীরা নিপুণা। জাপানে বয়স্ক লোকেরা প্রায়ই চুরুট, সিগারেট প্রভৃতির ধূমপান করে এবং কোনও অতিথি গৃহে আসিলে তাহাকে ধূমপান করিতে অনুরোধ করে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা-আইন প্রচলিত থাকায় এই দেশের বালক-বালিকা সকলেই লেখাপড়া শিখিতে বাধ্য। সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয় বৎসর, মধ্য বিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর ও উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই বৎসর পড়িবার পর ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। এই সময় ইহারা লিখন, পঠন, রচনা, অঙ্ক, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, চিত্রাঙ্কন, চীনা, ইংরাজী, জার্ম্মান, ফরাসীভাষা, সঙ্গীত, ব্যায়াম ও হাতের নানা প্রকার কাজ ইত্যাদি শিক্ষা করে। জাপানে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি শিক্ষার নিমিত্ত অনেক স্কুল ও কলেজ আছে। বালকেরা অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না। প্রাথমিক, মধ্য বা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়িবার পর অনেকেই নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করে। জাপানের ছেলে ও মেয়েরা অনেক সময় দল বাঁধিয়া দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করে। এইজন্য ছাত্রদিগের মধ্যে অনেক স্থানে ক্লাব বা সমিতি আছে।

জাপানী অক্ষরগুলি দেখিতে চীনা অক্ষরের মত। জাপানীরাও চীনাদের মত তুলির সাহায্যে লিখে। আজকাল

অনেক স্থানে রোমান অক্ষর বা ইংরাজী হরফের প্রচলন হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ বাড়ীতে অক্ষর পরিচয়ের পর স্কুলে ভর্তি হয়। তাহারা প্রাতে সাতটার সময়



একদল জাপানী বালক ড্রিল করিতেছে

হাত-মুখ ধুইয়া ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া দলে দলে স্কুলে যায়। বেলা বারটার সময় মধ্যাহ্ন-ভোজনের ছুটি হয়। অনেক ছাত্রই বাড়ী হইতে মধ্যাহ্নের আহার লইয়া যায়।

অপরাহ্ন দুইটার সময় স্কুলের ছুটি হয়। শনি ও রবিবারে স্কুল বন্ধ থাকে। শ্রেণী হিসাবে ছাত্রদিগকে সপ্তাহে বিশ হইতে ত্রিশ ঘণ্টা স্কুলে কাজ করিতে হয়। বাড়ীতে আসিয়া ছেলেরা অল্পক্ষণ পড়াশুনা করিয়া খেলাধূলা করে; মেয়েরা পাখা তৈয়ারী, চা তৈয়ারী, নাচ, গান প্রভৃতি শিক্ষা করে। বৈকাল পাঁচটার সময় রাত্রির আহার শেষ করিয়া স্নান করে। রাত্রিতে শুইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বালকবালিকারা পড়াশুনা ও খেলাধূলা করে।

জাপানে বাঁশ, কাঠ, কাগজ, চীনামাটি প্রভৃতি দিয়া সুন্দর সুন্দর খেলনা প্রস্তুত হয়। জাপানী ছেলেমেয়েরা খেলনা বড় ভালবাসে। বড় বড় শহরগুলিতে অনেক খেলনার দোকান আছে। ফেরিওয়ালারা গ্রামে গ্রামে ও বাড়ীতে বাড়ীতে খেলনা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। মেয়েরা নানা প্রকার পুতুল ভালবাসে। প্রতি বৎসর ৩রা মার্চ্চ তারিখে পুতুলের ভোজ-উৎসব হয়। আমাদের দেশের মেয়েদের মত ঐ দিনে জাপানী মেয়েরা পুতুলের বিবাহ দেয়, ঐ দিনে কোনও পুতুল রাজা সাজে, কেহ মন্ত্রী হয়, কেহ বর হয়, কেহ কনে হয় ইত্যাদি। মেয়েরা পুতুলগুলির সাম্‌নে ভাত, পিঠা, নানাবিধ ফলমূল প্রভৃতি সাজাইয়া ভোগ দেয় এবং নানাপ্রকার আমোদ-আহ্লাদ করে। বালকেরা ঘুড়ি উড়ায়; টেনিস, ফুটবল, হকি খেলে; জুজুৎসু প্রভৃতি নানাবিধ কসরৎ শিখে, এবং কাঠের

বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি লইয়া খেলা করে। জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে টেনিস খেলায় খুব নাম করিয়াছে।

৫ই মে তারিখে বালকদিগের ঘুড়ি-উড়ান-উৎসব হয়। এই সময় অনেকে মাছ-ঘুড়ি উড়ায়। জাপানে মাছ একটি সুলক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। এইজন্য অনেক গৃহের সাম্‌নে একটি বাঁশের খুঁটিতে কতকগুলি কাগজের মাছ উড়িতে দেখা যায়। রঙিন কাগজ দিয়া ইহারা নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর লণ্ঠন প্রস্তুত করে এবং উৎসবের সময়, বিশেষতঃ নববর্ষের দিন, সকলে আপন আপন আবাসগৃহ, গাছপালা প্রভৃতিও আলো দিয়া সুসজ্জিত করে। জাপানে বড় ও ছোট নানা প্রকারের চন্দ্রমল্লিকা ও অন্যান্য বহু প্রকারের সুন্দর সুন্দর ফুল হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে নানা রকম ফুল ফুটিলে জাপানীরা ফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য নদীর ধারে, বাগানে, ঝিলে ও জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কেহ কেহ বনভোজন বা চড়ুই-ভাতি করে।

ছুটির দিনে জাপানীরা ঘরে বসিয়া থাকিতে ভালবাসে না। ছুটি পাইলেই দলবদ্ধ হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করে এবং আপন আপন ইচ্ছামত আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিয়া ছুটি উপভোগ করে।

চীন দেশের ছেলেমেয়ে

ভারতের উত্তরে অতি উচ্চ হিমালয় পর্ব্বত,—হিমালয়ের অপর ধারে তিব্বত ও চীন। চীন অতি প্রাচীন ও সুসভ্য দেশ। ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে ও অন্যান্য নানা কারণে ভারত ও চীনে বহুকাল হইতে আদান-প্রদান ও লোক যাতায়াত চলিয়া আসিতেছে। অনেক লোক এখনও ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে আসাম পার হইয়া চীনে গমন করে। বহু চীনা ব্যবসায়ী অশ্বপৃষ্ঠে মালপত্র বোঝাই করিয়া ভারত ও উত্তর-ব্রহ্মে যাতায়াত করে, কিন্তু সাগরপথে যাতায়াতই সুবিধাজনক। এক হিসাবে চীনারা আমাদের প্রতিবেশী।

চীনে বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোকই বেশি। প্রাচীনকালে চীনে **কনফুসিয়াস্** নামক একজন জ্ঞানী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, চীনের অনেক লোক এখনও তাঁহার মতাবলম্বী। ইহা ছাড়া তাও ধর্ম্মও প্রচলিত আছে। বহুকাল হইতে চীনে রাজতন্ত্র শাসন প্রচলিত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীনা স্বদেশ-প্রেমিক ডাক্তার **সান ইয়াৎসেনের** চেষ্টায় চীনে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রচলিত হয় এবং চীনারা নানাদিকে উন্নতি সাধন করে। তারপর বিদেশীদের চক্রান্তে চীনে বহুদিন গৃহযুদ্ধ চলে। এখন চীন সম্পূর্ণ স্বাধীন ও উন্নতিশীল রাষ্ট্র।

চীনের অধিকাংশ লোক পূর্ব্বে আফিঙ খাইত। এখন এই কু-অভ্যাস আর কাহারও নাই। শত শত চীনা ছাত্র এখন ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পড়িতেছে।



চীনের একটি নদী
(অনেক চীনা পরিবার বংশানুক্রমে নৌকায় বাস করে)

চীনা যুবক ও ছাত্রেরা মনে প্রাণে দেশের কল্যাণার্থে নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যাদি করিতেছে।

চীনারা দেখিতে গৌরবর্ণ, বেঁটে ও নাক-বোঁচা। ইহাদিগকে পীত জাতি বলে। চীনের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। এখানকার জমি বেশ উর্ব্বর। এখানে প্রচুর

ধান, চা, চিনি, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চীনারা পাকা ব্যবসাদার। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র চীনা দোকানদার, ফেরিওয়ালা ও শিল্পী, বিশেষতঃ সূত্রধর দেখিতে পাওয়া যায়। **কাণ্টন, হংকং ও সৌউটাউ** এখানকার প্রাচীন বন্দর। এগুলি ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট বন্দর আছে। এই সকল বন্দরে দেশ-বিদেশ হইতে কলকব্জা, কাপড় প্রভৃতি আমদানি হয়। চীনে প্রচুর খনিজ দ্রব্য, বিশেষতঃ কয়লা পাওয়া যায়। আগে এই সকল দ্রব্যের সম্যক্ ব্যবহার হইত না, এখন পূর্ণোদ্যমে হইতেছে।

চীনের দক্ষিণে তিব্বতের পর্ব্বত ও মালভূমি। ইহাও এখন প্রায় চীনেরই অন্তর্ভুক্ত। চীনের উত্তরে কোনও বড় পর্ব্বত না থাকায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার নিমিত্ত চীনারা প্রাচীনকালে রাজধানী পিকিং শহর হইতে প্রায় ১৫০০ মাইল লম্বা এক বৃহৎ প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিল। এই প্রাচীর স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গেলেও ইহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপরিভাগ এত চওড়া যে, ইহার উপর দিয়া অনায়াসে গাড়ী, ঘোড়া, অশ্বারোহী সৈন্য প্রভৃতি চলিয়া যাইতে পারে।

চীনারা ছেলেদের খুব ভালবাসে ও যত্ন করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার তিন দিনের মধ্যে মাতা তাহার হাতে একগাছি লাল সূতা বাঁধিয়া দেন। এই সূতা একপক্ষকাল বাঁধা

থাকে। কোনও কোনও শিশুর গলায় লাল সূতা দিয়া রৌপ্য-নির্ম্মিত ছোট ছোট খেলনা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। চীনারা বিশ্বাস করে যে, এইরূপ করিলে শিশুর কোনও অনিষ্ট হইবে না।

একমাস পরে শিশুর মস্তক মুণ্ডন ও নামকরণ উৎসব হয়।



দুইটি চীনা শিশু

ক্ষৌরকর্ম্মের সময় শিশুকে লালরঙের পোষাক পরাইয়া দেওয়া হয়। নাপিত বা নরসুন্দর মহাশয়ও এই উপলক্ষে লাল পোষাক পরিয়া বেশ সাজগোজ করিয়া উপস্থিত হন। পূর্ব্বে চীনারা মাথার মধ্যস্থলে এক গোছা চুল রাখিয়া, চারিদিকের

সমস্ত চুল কামাইয়া দিত। এই চুলের গুচ্ছ আজীবন থাকিত, ইহা কখনও ছাঁটা হইত না। ইহাকে চীনাদের বেণী বলিত। আজকাল এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এখন প্রায় সকল চীনাই আমাদের মত চুল ছাঁটে।

মস্তক মুণ্ডনের পর শিশুর ঠাকুরমা প্রথমে তাহার মুখ দেখেন। শিশুটি পুত্র হইলে তিনি নানা প্রকার আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহাকে সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দেন। আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধব অনেকেই এই সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। তাঁহারাও শিশুকে যথাসাধ্য উপহার দেন ও আমোদ-আহ্লাদ করেন। বাড়ীতে এই উপলক্ষে একটি ভোজ হয়। শিশুর নামকরণও এই দিন হইয়া যায়। চীনারা এই নামকে 'দুধের নাম' বলে। শিশু বড় হইয়া স্কুলে যাইবার সময় তাহার আর একটি নাম হয়। আবার যুবা বয়সে গার্হস্থ্যাশ্রমের সময় পুনরায় তাহার একটি নাম হয়। সুতরাং এক একটি চীনার তিন তিনটি নাম।

বালিকাদের সকল সময়ে এইরূপ নামকরণ হয় না। বড় হইয়া তাহারা 'দুধের নাম' বলিতে খুব লজ্জা বোধ করে। মেয়েদের নাম কখনও কখনও 'আর না' ১নং, ২নং, ৩নং ইত্যাদি হয়। আমাদের দেশের ন্যায় চীনে কন্যা অপেক্ষা পুত্রেরই আদর বেশি। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে মাতাপিতা বা আত্মীয়-স্বজন বড় বেশি আনন্দ প্রকাশ করেন না। মেয়েদের জীবনব্যাপী

তুঃখ-কষ্টের অবসান করিবার জন্য, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে গঙ্গাসাগরে ছেলে ফেলিয়া দেওয়ার মত, সেই দেশের অনেক মেয়েকে শিশু অবস্থায় জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। এক সময়ে ফুচু নগরে নদীর ধারে এইরূপ নোটিশ দেওয়া ছিল—"এখানে বালিকা ডুবাইয়া মারিও না।" এখন এই নৃশংস প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

চীনারা সকলেই বৎসরের প্রথম দিনে জন্মোৎসব পালন করে; যে দিন যে তিথিতে যাহার জন্ম, ঠিক সেই দিন বা সেই তিথিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জন্মোৎসব করে না। শিশুর প্রথম জন্মোৎসবের সময় ঠাকুরমা তাহাকে একজোড়া লাল জুতা ও লাল টুপি উপহার দেন। শিশু হাঁটিতে পারিলে এইগুলি পরে।

মস্তক মুণ্ডন ও নামকরণ উপলক্ষে ভোজের দিনে চীনারা নানা প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত করে। আমরা যে সকল জিনিস খাই, চীনারাও প্রায় তাহাই খায়। ঐ দিন একটি টেবিলে বই, জুতা, বোতাম, তুলদাঁড়ি, সোনার টুক্‌রা, টাকা প্রভৃতি নানা প্রকার জিনিস রাখিয়া শিশুকে তাহার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শিশু প্রথমে যে জিনিসটি হাতে করিয়া লয়, চীনারা তাহা হইতে শিশুর ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা পোষণ করে। তাহারা মনে করে যে, শিশু বোতাম হাতে করিয়া তুলিয়া লইলে মান্দারিণ বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হইবে, টাকা বা তুলাদণ্ড হাতে লইলে ধনী হইবে

ইত্যাদি। এই সকল ধারণা বা ভবিষ্যদ্-বাণী প্রায়ই ভুল হয়, তথাপি চীনের অনেক লোকই মনে করে যে, ইহা ঠিক। আমাদের দেশেও অনেক স্থানে অন্নপ্রাশনের দিনে ছেলের কাছে এইরূপে দোয়াত, কলম, টাকা, মাটি প্রভৃতি রাখিয়া, তাহাকে ইচ্ছামত যে কোনটা ধরিতে দেওয়া হয়। অনেকের বিশ্বাস, ইহাদ্বারা নাকি শিশুর ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয়।

আমাদের দেশে 'চলন' করিয়া নেওয়ার মত চীনেও এই দিন শোভাযাত্রা করিয়া শিশুকে গ্রাম বা শহরের মধ্যে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়। শিশু একটি চেয়ার বা পাল্কিতে শুইয়া থাকে। বাহকেরা পাল্কি লইয়া যায় ও গ্রামের বালকেরা লম্বা লম্বা প্ল্যাকার্ড লইয়া অগ্রে দৌড়াইয়া যায়। তাহাতে এই সকল কথা লেখা থাকে—"রাস্তা ছাড়", "চুপ কর", ইত্যাদি।

শীতের সময় যখন খুব শীত পড়ে, তখন এক একটি চীনা শিশু পাঁচ-ছয়টি পর্য্যন্ত তূলার কোট পরিধান করে। কাজেই ইহাদিগকে তখন অনেকটা ফুটবলের মত গোলগাল দেখায়!

ছয় বৎসর বয়সে একটি ভাল দিন দেখিয়া চীনা বালক স্কুলে যায়। যাইবার সময় গুরুর জন্য বাটী হইতে কিছু উপহার লইয়া যায়। বিদ্যালয়ে গিয়া প্রথমে চীনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কন্‌ফুসিয়াসের প্রতিমূর্ত্তির নিকট ও পরে গুরুর নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে; তাহার পর ছোট একটি টুলে বসিয়া

গুরুর নিকট পাঠ গ্রহণ করে। প্রত্যেক বালকের সাম্‌নে একটি ছোট টেবিল থাকে।

চীনা ভাষায় এক একটি শব্দের জন্য এক একটি অক্ষর বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সুতরাং অক্ষরগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য সেখানে বালকদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়।



চীনা বালক ও বালিকা

চীনারা লিখিবার জন্য তুলি বা ব্রাস ব্যবহার করে। এক প্রকার কালির চাক্তি পাওয়া যায়। তাহাতে জল দিয়া তুলির সাহায্যে লিখিয়া থাকে। আজকাল চীনা অক্ষর সমূহ যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে।

চীনা বালকেরা চীৎকার করিয়া পাঠ আবৃত্তি করে ও পাঠ প্রস্তুত হইলে শিক্ষকের নিকট পাঠ দেয়। চীনে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত স্কুল খোলা থাকে। কেবল বেলা দশটার সময় দুই-এক ঘণ্টা মাত্র আহারের জন্য ছুটি দেওয়া হয়। আমাদের পুস্তকের যেখানে শেষ, আরবি বা পারসি পুস্তকের মত চীনা পুস্তক সেইখান হইতে আরম্ভ। ডাইন দিক হইতে পড়া আরম্ভ করিয়া লম্বালম্বি ভাবে উঁচু হইতে নীচের দিকে পড়িতে হয়। আমাদের দেশের ছেলেরা অঙ্ক কষিতে না পারিলে অনেক সময় মাথা চুলকায়, কিন্তু চীনের ছেলেরা পা ঘসে। চীনা বালকেরা শিক্ষককে খুব ভক্তি করে। তাহারা গল্পের বই খুব কম পড়ে। প্রথম হইতেই পড়িতে আরম্ভ করে "মানব প্রকৃতি স্বভাবতঃই উত্তম" ইত্যাদি। ভাষা আয়ত্ত করিতে অধিক সময় যায় বলিয়া অনেক চীনা বালক ভাল অঙ্ক কষিতে পারিত না। চীনের সাধারণ লোকে অঙ্কে এইরূপ অপটু ছিল যে, চীনদেশের অনেক দোকানে ক্রেতাকে হিসাব বুঝাইবার জন্য গোল গোল বল দেওয়া বোর্ড থাকিত। কিন্তু এখন তাহারা সব বিষয়েই খুব অগ্রসর হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আগে চীনে মেয়েদের বড় কষ্ট হইয়াছে। তাহাদের ধারণা ছিল যে, যে মেয়ের পা যত ছোট, সে তত সুন্দরী। সুতরাং প্রথম হইতেই নানা প্রকার অস্বাভাবিক

উপায়ে তাহাদিগের পা ছোট করা হইত। ইহার ফলে মেয়েরা ভালরূপে চলিতে পারিত না। অনেক সময়ে পা ছোট বলিয়া ভালরূপ দৌড়াইতে পারিত না। মেয়েরা সাধারণতঃ স্কুলে যাইত না। তাহারা বাড়ীতে বসিয়া সেলাই, সূতা কাটা, তাঁত বোনা প্রভৃতি নানা প্রকারের কাজ শিখিত। গরীবের ঘরের মেয়েদের খাটিয়া খাইতে হয়, কাজেই তাহারা পা ছোট করিত না। আজকাল এই কুপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে এবং মেয়েরাও ছেলেদের মত শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঁশ, কাগজ, তালপাতা প্রভৃতি দিয়া নানা প্রকার সস্তা খেলনা চীনে প্রস্তুত হয়। ফেরিওয়ালারা যখন খেলনার ঝাঁকা পিঠে করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে চীনা পাড়ার মধ্য দিয়া যায়, তখন ছেলের দল তাহাকে ঘিরিয়া ধরে।

সে দেশের ছেলেরা লুকোচুরি, মাছ ধরাধরি, মার্ব্বেল প্রভৃতি নানা প্রকার খেলা করে। তাহারা ঘুড়ির খুব ভক্ত। বৎসরের একদিন ঘুড়ি-উড়ানো পর্ব্ব হয়। সেদিন দেশের ছোট বড় সকলেই ঘুড়ি উড়াইতে লাগিয়া যায়। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সখ ও উৎসাহ এত বেশি যে, সে দেশে রাত্রিতেও ঘুড়ি উড়ে। মাছ ঘুড়ি, পাখী ঘুড়ি ইত্যাদি নানা প্রকারের ঘুড়ি সে দেশে তৈয়ারী হয়। এক একটি ঘুড়ি এত বড় যে, তাহা তুলিতে তুইজন লোকের আবশ্যক হয়। রাত্রিতে কখনও কখনও ঘুড়িতে চীনা লণ্ঠন বা সুন্দর সুন্দর আলো

জ্বালিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বাজি পোড়ান, পুতুল নাচ, পাখীর লড়াই, ফড়িঙের লড়াই প্রভৃতি নানা প্রকারের মজার মজার খেলা সে দেশে প্রচলিত আছে।

চীনারা আগে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস প্রভৃতি খেলা খুব বেশি পছন্দ করিত না। তাহারা বলিত যে, রৌদ্রের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিয়া যাহারা এই সকল খেলা খেলে, তাহারা পাগল। এখন অবশ্যই এইসব ধারণা দূর হইয়াছে। চীনে ব্যাড্‌মিণ্টনের মত এক প্রকার খেলা প্রচলিত আছে। উহাতে সাটল কক্ বা বলটি ব্যাটের সাহায্যে না মারিয়া পা, কনুই, হাঁটু বা কাঁধ দ্বারা মারিতে হয়; হাত কিছুতেই ব্যবহার করিতে পারা যায় না। চীনারা যেরূপ দক্ষতার সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া বলটি মারিতে থাকে, তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। চীনারা দাবাও খেলে। এই খেলা আমাদের দেশ হইতে কিছু স্বতন্ত্র, কারণ ইহাতে একটি বাড়তি গুটি থাকে, তাহার নাম 'কামান'। টেবিলের উপর 'মাডাং' নামক এক প্রকার খেলা চীনারা খেলে।

চীনারাই কাগজ তৈয়ারি, অক্ষর খুদিয়া ছাপা প্রভৃতি বহু আবিষ্কারে পৃথিবীতে অগ্রণী ছিল। এখন আবার তাহারা যেরূপ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, ইহারা অচিরেই পৃথিবীতে এক শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে গণ্য হইবে।

শ্যামদেশের কথা

শ্যাম এশিয়ার মধ্যে পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অন্তর্গত একটি বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক দেশ। এখানে অনেক নদ-নদী আছে; তন্মধ্যে মেনাম, সেবাং, মেক্‌লাঙ্গ, পিতৃয়ু ও শান্তিবন প্রধান। পাহাড়-পর্ব্বত যাহা আছে, তাহা খুব উচ্চ নহে ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। জলবায়ু অনেকটা আমাদের দেশের মত। বর্ষায় সমস্ত দেশ জলপ্লাবিত হইয়া যায় ও জমিতে পলি পড়ে। কাজেই ধান্য, ইক্ষু, তূলা, তামাক, গোলমরিচ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অরণ্যজাত দ্রব্য, যথা—শ্বেত ও রক্ত চন্দন, বাহাদুরি কাষ্ঠ, গঁদ প্রভৃতি এদেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়। শ্যামবাসীরা আপনাদিগকে থাই জাতি বলিয়া থাকে। থাই শব্দের অর্থ স্বাধীন। এজন্য বর্ত্তমানে এদেশের অপর নাম হইয়াছে থাইল্যাণ্ড।

বর্ত্তমান রাজধানী **ব্যাঙ্কক** শহর মেনাম নদীর তীরে অবস্থিত; শহরের মধ্যে অনেক খাল আছে। চীনাদের মত বহু লোক পুরুষানুক্রমে নৌকায় বাস করে। লোকে শহরের এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার জন্য অনেক সময় নৌকায় চড়িয়া যাতায়াত করে। হাট-বাজারও নৌকায় বসে। হাট বা বাজারের সময় অনেকগুলি নৌকা পাশাপাশি

ভাবে লাগিয়া থাকে। ক্রেতারা স্বচ্ছন্দে এক নৌকা হইতে অপর নৌকায় গিয়া পছন্দমত জিনিস ক্রয় করে। নদী এখানে প্রায় আধ মাইল বিস্তৃত। ইটালির ভিনিস শহরের

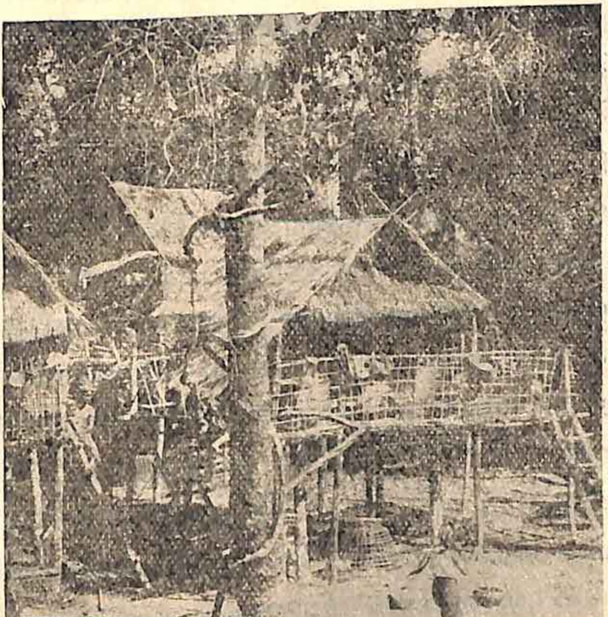


নৌকার উপরে শ্যামদেশের বাজার

অবস্থা অনেকটা এইরূপ, সুতরাং অনেকে ইহাকে প্রাচ্যের ভিনিস নগরী বলেন।

ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট নদী ও খাল আছে বলিয়া এখানে রাস্তাঘাট আদৌ নাই, ইহা যেন কেহ মনে না করেন।

সেখানে আমাদের দেশের বড় বড় শহরের মত রাস্তা আছে এবং তাহাতে ট্রাম, বাস, রিক্সা প্রভৃতি চলাচল করিতেছে। তবে প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ গরুর গাড়ীরও অভাব সে



শ্যামদেশের কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর

দেশে নাই। রাস্তার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট কাষ্ঠনির্ম্মিত বহু ঘর আছে। এইগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

শহরের প্রায় অর্দ্ধেক লোক চীনা। তাহারাই এখানকার প্রধান শিল্পজীবী। শ্রমিকের কার্য্যে তাহারাই অগ্রণী। রাস্তা ঝাঁট দেওয়া হইতে দোকানদারি করা পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই চীনারা করিয়া থাকে। তাহারা বরফ, আইসক্রীম, সোডা, ভাত, তরকারী প্রভৃতি রাস্তায় বা বাজারে ফেরি করিয়া বেড়ায়। পথে বাহির হইলেই নীলরঙের পোষাক-পরিহিত চীনা মজুর দেখা যায়। শ্যামের অধিবাসীরা বেশ শান্তিপ্রিয় ও পরিশ্রমী। কৃষিই তাহাদিগের প্রধান উপজীবিকা। তাহারা পল্লীগ্রামে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে।

শ্যামে প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আনুমানিক ৫২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের দুইজন ব্রাহ্মণ-কুমার শ্যামরাজ্য স্থাপন করেন। শ্যামবাসীরা বলে যে, অরণারত বা অরুণারথ তাহাদিগের প্রথম রাজা। প্রাচীন রাজধানী **যুধিয়া** বা **অযুধিয়া** (অযোধ্যা ?) নগরী ব্যাঙ্কক হইতে ৫৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে এবং এই দেশের নানা স্থানে বহু প্রাচীন শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমান হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার তিন-চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল; এখন এখানে বহু বৌদ্ধ শ্রমণ ও সন্ন্যাসীর বাস। তাঁহারা হল্‌দে পোষাক পরিয়া তালবৃন্ত ও লৌহপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। পাত্র পূর্ণ হইলে আশ্রমে ফিরিয়া

যান। সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধ আচার-ব্যবহার পালন করেন ও ব্রাহ্মণদের মত নানা প্রকার দৈবকার্য্যও করিয়া থাকেন। দেশের সকল লোকই অন্ততঃ কিছু কালের জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন, ব্রহ্মদেশের মত তাঁহারাই তথাকার লোক-শিক্ষক। বালকেরা তাঁহাদেরই নিকট সামান্য রকম লেখা-পড়া ও ধর্ম্মকর্ম্মাদি পালন করিতে শিখে।

কথিত আছে, রাজা অরুণারথই শ্যামে প্রথম বর্ণমালা প্রচলন করেন। এখানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে অনেকগুলি স্বর ও ৪৩টি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে কম্বোজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া শ্যাম স্বাধীন হয়। তাহারই স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ শ্যামবাসীরা নিজেদের ভাষাকেও থাই ভাষা বলিয়া থাকে।

শ্যামে নানা প্রকার বীরত্বকাহিনীপূর্ণ হিতোপদেশক গল্প প্রচলিত আছে। তথাকার প্রচলিত অনেক গল্প রামায়ণ ও মহাভারত হইতে গৃহীত। পালি ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতেও অনেক গল্প লওয়া হইয়াছে।

পল্লীগ্রামের ছেলেরা লিখিবার জন্য কেবল শ্লেট ব্যবহার করে। কাগজের ব্যবহার কম। ছাত্রেরা গুরুর নিকট আসন করিয়া বসিয়া পাঠ গ্রহণ করে। আজকাল ব্যাঙ্কক শহরে নব্য ধরনের স্কুল স্থাপিত হইয়াছে ও তাহাতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষকগণ ইংরাজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্যামে রাজার খুব সম্মান। তাঁহাকে ইহারা দেবতার চক্ষে দেখিয়া থাকে। বহুপূর্ব্বে লোকে রাজদর্শন পর্য্যন্ত করিতে পারিত না। রাজা রাস্তায় বাহির হইলে লোকে মাথা নীচু করিয়া ধূলার উপর শুইয়া পড়িত। আজকাল এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এখন রাজাকে দেখিলে তাহারা মাথা নত করিয়া অভিবাদন করে। রাণী কিন্তু এখনও পর্দ্দানশীন ভাবেই থাকেন, কখনও বাহির হইবার আবশ্যক হইলে ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কিতে চড়িয়া বেড়ান।

বুদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যুর দিনে অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমায় ও কৃষিপর্ব্বে শ্যামে খুব আমোদ ও উৎসব হয়। সেই সময় রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণ উৎসবে যোগদান করেন। কৃষিপর্ব্বের সময় প্রধান মন্ত্রী হল চালনা করেন ও রাজকুমারীগণ বীজ বপন করেন। লোকে সেই বীজ দুই-একটি কুড়াইয়া লইয়া নিজের বীজের সহিত মিশাইয়া লয়।

তথায় অনেক লোকে শ্বেতহস্তীর পূজা করিয়া থাকে। জাতীয় পতাকায় পর্য্যন্ত শ্বেতহস্তী অঙ্কিত আছে। দুই-চারিটি শ্বেতহস্তী এখনও সে দেশের বনজঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে তাহাদিগকে শ্বেতহস্তী বলে, কিন্তু সেগুলি দেখিতে আদৌ শ্বেতবর্ণের নহে, অনেকটা ধূসর বর্ণের। সাধারণ কাল হস্তীও সেখানে পাওয়া যায় ও আমাদের দেশের মত খেদা নির্ম্মাণ করিয়া লোকে বন হইতে আবশ্যকমত হস্তী ধরিয়া

আনে। যাতায়াতের জন্য হস্তীর আবশ্যক হয়। তাহা ছাড়া ব্রহ্মদেশের মত সেখানেও হাতীতে বড় বড় গাছ বনজঙ্গল ও পাহাড় হইতে টানিয়া আনে।

শ্যামের অধিবাসীরা দেখিতে অনেকটা ব্রহ্মবাসীদের মত, আকারে চীনাদের অপেক্ষা ছোট। ইহাদিগকে দেখিয়া মঙ্গোলীয় জাতি বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের সাঁওতাল, কোল, ভীলদের মত এখানেও বন্য জাতি আছে। ইহাদিগের আচার-ব্যবহার অনার্য্যদিগের মত এবং ভাষাও স্বতন্ত্র।

শ্যামের ছোট ছোট হল্‌দে রঙের শিশুগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। তাহাদের গায়ের রঙ হল্‌দে নহে। মশা ও মাছির উৎপাত হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সময় মাতারা শিশুকে হলুদমিশ্রিত এক প্রকার প্রলেপ মাখাইয়া দেন। সেখানে ঘরে ঘরে দোলনা আছে। শিশুগুলি দোলনায় শুইয়া থাকে। কাঁদিলে মা আদর করিয়া দোলনা নাড়াইয়া দেন ও শিশু দুলিতে দুলিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

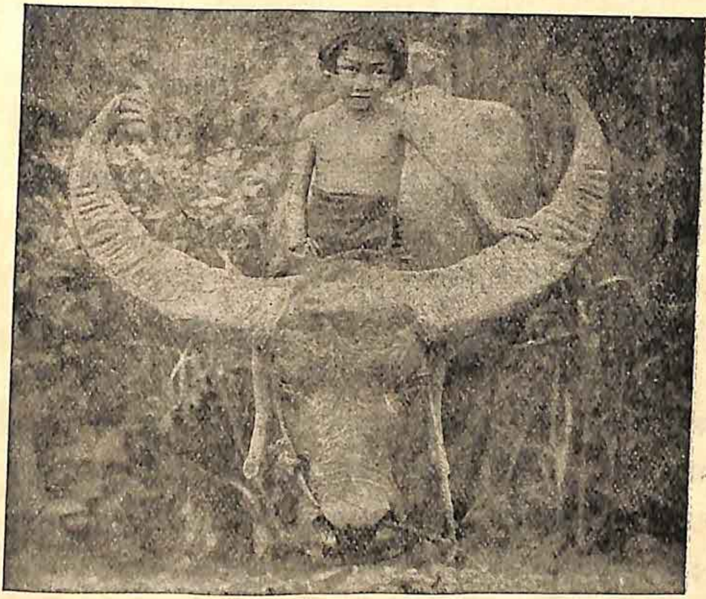
শিশুরা সে দেশে হাঁটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সাঁতার কাটিতে শিখে। কথাটা শুনিয়া অনেকেরই আশ্চর্য্য বোধ হইবে। ছোট ছোট শিশুর গলায় কর্ক বা শোলা বাঁধিয়া তাহাকে জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শিশু জলে ভাসে ও হাত-পা নাড়িয়া সাঁতার কাটিতে শিখে। জল দেখিয়া ছেলেরা আদৌ ভয় করে না। তাহারা প্রাতে উঠিয়াই বাড়ীর

নিকটবর্ত্তী কোনও নদী বা খালে কিছুক্ষণ স্ফূর্ত্তির সহিত স্নান করিয়া ও সাঁতার কাটিয়া আসে ; স্নানের পর আহার করে।

ছেলেরা ছোট ছোট কাপড় মালকোচা দিয়া পরে। উহা দেখিতে অনেকটা হাফ্‌প্যান্ট্‌ পরার মত হয়। তবে পল্লীগ্রামে ও সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলেরা আট-দশ বৎসর পর্য্যন্ত কাপড় খুব কমই পরে। মেয়েরা অল্প বয়স হইতেই কাপড় পরিতে আরম্ভ করে ও বড় হইলে জ্যাকেট ও চাদর ব্যবহার করে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মাথায় টিকির মত চুলের গুচ্ছ থাকে। দশ-এগার বৎসর বয়সে আমাদের দেশের উপনয়ন-সংস্কারের মত এই চুলের গুচ্ছ মুণ্ডন করা হয়। এই উপলক্ষে সকলেই সাধ্যমত ধূমধাম করে। গৃহের মধ্যে এক উচ্চ মঞ্চ বা বেদীর উপর, যে বালক বা বালিকার মস্তক মুণ্ডন করা হইবে তাহাকে বসান হয়। পুরোহিত ও সন্ন্যাসিগণ উচ্চ আসনে বসিয়া থাকেন ও নিমন্ত্রিত আত্মীয়-কুটুম্ব ও বন্ধু-বান্ধবগণ মেঝের উপর সপে বসেন। সকলে আসন গ্রহণ করিলে বালক বা বালিকাটি প্রথমে পুরোহিত বা সন্ন্যাসীদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে দাঁড়ায়। তখন সন্ন্যাসীরা মন্ত্র আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান কোনও ব্যক্তি তিন অংশের এক অংশ চুল মুণ্ডন করিয়া দেন। বাকী দুই অংশ চুলের গুচ্ছ বাড়ীর

বয়োবৃদ্ধ দুইজনে মুণ্ডন করিয়া দেন। তাহার পর ঐ মুণ্ডিত মস্তকে পুরোহিত জলধারা দিয়া বালক বা বালিকাকে স্নান করান। এইরূপে উৎসব শেষ হয়, কিন্তু দুই-তিন দিন ধরিয়া



শ্যামদেশের বালক মহিষ চরাইতেছে

নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ, ভোজ ও উৎসব চলিতে থাকে। মস্তক-মুণ্ডন-উৎসব হইয়া গেলে বালকেরা আমাদের মত চুল রাখে ও ছোট ছোট করিয়া ছাঁটে।

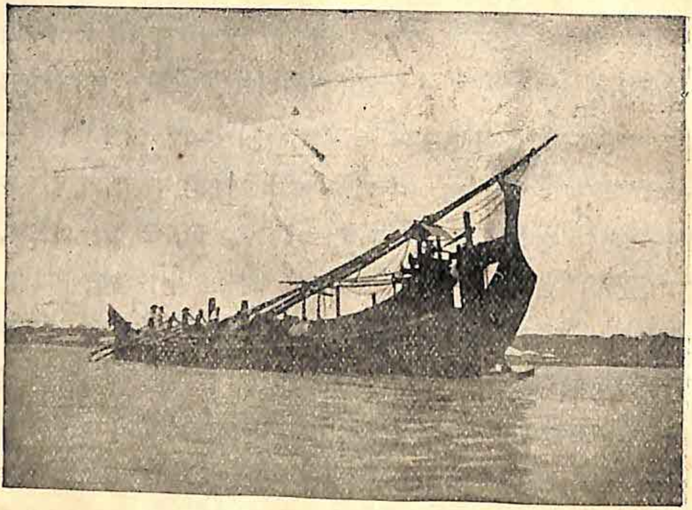
ছেলেরা কাদা লইয়া খেলা করিতে বড় ভালবাসে। পরস্পরের প্রতি কাদা ছুঁড়িয়া মারে ও পরে নদীতে গিয়া সাঁতার কাটে। উচ্চস্থান হইতে জলে লাফাইয়া পড়ে। বড় বড় গাছে—এমন কি নারিকেল গাছে পর্য্যন্ত—অবলীলাক্রমে চড়িতে পারে। প্রায় সকলেই অল্প অল্প রাঁধিতে পারে। আমাদের মত মাছ, ভাত, তরিতরকারি প্রভৃতি আহার করে। ছেলে-বুড়ো সকলেই তামাক খায়। বালকেরা একটু বড় হইলে ধান্য বা ইক্ষু ক্ষেত্রে কাজ করে; গরু বা মহিষের পৃষ্ঠে চড়িয়া গৃহপালিত পশু চরাইয়া বেড়ায়। মেয়েরা চাউল ছাঁটা, রন্ধন করা, পিষ্টক প্রস্তুত করা, গৃহপালিত পশুপক্ষীর রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রভৃতি নানা প্রকার গৃহকার্য্য শিক্ষা করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্যামে প্রচুর বারিপাত হয়। যখন কড়-কড় করিয়া মেঘ ডাকে ও বিদ্যুৎ চমকায়, তখন বালক-বালিকারা বলাবলি করে, 'আকাশ-দেবতা ও তাঁহার স্ত্রীতে ঝগড়া লাগিয়া গিয়াছে। সেইজন্য রাগে তাঁহারা হুড়মুড় করিয়া শব্দ করিতেছে।' আবার বৃষ্টিপাত হইলে তাহারা বলে যে, 'স্বর্গে আকাশ-কন্যা ও পরীরা স্নান করিতেছেন। আর সেই জলধারায় ধরা অভিষিক্ত হইতেছে।'

ব্রহ্মদেশের ছেলেমেয়ে

ভারতের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ। ইহার লোকসংখ্যা ভারতের অনেক প্রদেশ অপেক্ষা কম। ইহার উত্তরে আসাম প্রদেশ ও চীনরাজ্য, পূর্ব্বে শান ও কম্বোডিয়া-রাজ্য, দক্ষিণে শ্যামরাজ্য এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও বঙ্গদেশ। এই দেশ পর্ব্বত-বহুল হইলেও সালবীন, থালবীন ও ইরাবতী নদীর পার্শ্বস্থিত স্থানসমূহে ধান্য, গম, কলাই, তামাক, চা, কলা, পেঁপে, কমলালেবু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পাহাড়, অরণ্য, নদনদী ও ধান্যক্ষেত্র এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে। ইরাবতী নদী পাহাড়ের গা বহিয়া কুলু-কুলু রবে প্রবাহিত হইতেছে। ব্রহ্মের খনিজ সম্পদও প্রচুর। এখানে সোনা, রূপা, টিন, কেরোসিন তৈল, কয়লা, লৌহ ও নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায়। এই দেশ হইতে প্রচুর ধান্য ও চাউল বিদেশে চালান হয়। ব্রহ্মের সেগুন কাষ্ঠ প্রসিদ্ধ। অতুল কৃষিজ, খনিজ ও বনজ সম্পদের অধিকারী হওয়ায় এই দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রসার হইতেছে। টলেমির ভূ-বৃত্তান্তে এই দেশকে সুবর্ণভূমি বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই এই দেশকে সুবর্ণভূমি বলায় কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় নাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রহ্মের সহিত ভারতের আদান-প্রদান চলিয়া আসিতেছে। অনেকে মনে করেন যে, হিন্দু-দেবতা ব্রহ্মা এই দেশ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে ব্রহ্মা বা বার্ম্মা। আমাদের দেশের সাধারণ লোকে



ইরাবতী নদীর দৃশ্য

ইহাকে 'মগের মুল্লুক' বলে। ব্রহ্মের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, আরাকান, খাতুন, মার্ত্তাবান ও পেগু রাজ্যের প্রাচীন রাজারা আপনাদিগকে হিন্দুবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। আরাকান অঞ্চলে এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে,

বুদ্ধের জন্মের বহুপূর্ব্বে বারাণসীর জনৈক রাজপুত্র রসাবতী নগরে রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি প্রতি বৎসর বারাণসী-রাজকে কর দিতেন। কেহ কেহ বলেন যে, বারাণসীরাজ শেক্যবতী (যিনি পরজন্মে শাক্যসিংহরূপে জন্মগ্রহণ করেন) তাঁহার চতুর্থ পুত্র কম্মিলের উপর ব্রহ্মের শাসনভার অর্পণ করেন; তাঁহার রাজ্য মালয় ও শ্যাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর একটি উপাখ্যান পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে সূর্য্যবংশোদ্ভব শাক্য বংশের এক রাজা তাগোয়াং নগরে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পর এই বংশের চল্লিশজন রাজা ব্রহ্মে রাজত্ব করেন। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে আলম্রা নামক একজন ব্যাধ তাঁহার বীরত্ব ও বাহুবলে সেনাপতির পদলাভ করেন ও দেশের নেতা বলিয়া গণ্য হন। কালক্রমে তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ব্রহ্মের রাজত্ব লাভ করেন। এমন কি পেগু, আরাকান প্রভৃতি রাজ্যও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। তিনি শ্যামদেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে তথায় গমন করিলে ঐ দেশে তাঁহার মৃত্যু হয়। আলম্রা-বংশের রাজগণই ব্রহ্মের শেষ রাজবংশ। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত ব্রহ্মবাসীদের প্রথম যুদ্ধ হয়। ব্রহ্ম-সেনাপতি বাহুলা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হয়। ইহার পর আর দুইবার ব্রহ্মের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হয়। পরিশেষে ব্রহ্মরাজ থিব ইংরাজদিগের নিকট

সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন এবং ব্রহ্মদেশ ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যায়। বর্ত্তমানে ইহা স্ব-শাসিত রাজ্য।

এই দেশের লোকসকল গৌরবর্ণ ও বেঁটে। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই লুঙ্গি পরে এবং চীনাদের মত এঞ্জি নামক ছোট জামা ব্যবহার করে। পুরুষেরা মাথায় একটি রুমাল বা চাদর বাঁধে, আর স্ত্রীলোকেরা চাদরটি কাঁধের পাশ দিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া দেয়। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই মাথায় চুল রাখে এবং এই চুল চূড়ার মত করিয়া বাঁধে। তখন ইহা দেখিতে অনেকটা ছোট মঠের মত হয়। ছেলে ও মেয়েরা অনেক সময় মাথায় ফুল গুঁজিয়া খেলা করিয়া বেড়ায়। ইহারা ফুলের খুব ভক্ত। অনেকেই এত সৌখীন যে, পরিধানের জন্য নানা প্রকার রঙিন লুঙ্গি ব্যবহার করে। এই দেশের মেয়েদের মধ্যে পর্দ্দাপ্রথা প্রচলিত নাই। তাহারা গৃহের যাবতীয় কার্য্য করে এবং হাট-বাজারে যায়। মেয়েরা এই দেশের পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বেশি পরিশ্রম করে। স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই, এমন কি ছোট ছোট বালকবালিকারাও চুরুটের ধূমপান করে। বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থাকায় পিতার অনুমতি সাপেক্ষ হইলেও বিবাহে কন্যার সম্মতি আবশ্যক। স্বামী বা স্ত্রী যে কেহ ইচ্ছা করিলে গ্রামের বৃদ্ধ লোকদের মতানুসারে বিবাহবন্ধন ছেদ করিতে পারে। ব্রহ্মের অনেক স্ত্রীলোকই বেশ ভালরূপে তাঁত চালাইতে পারে।

বর্ম্মীরা পুত্র অপেক্ষা কন্যাই বেশি পছন্দ করে। জন্মগ্রহণের পনের-ষোল দিন পরে শিশুর নামকরণ হয়। এই দিনে শিশুর মস্তক মুণ্ডন করা হয়। শুভদিনে ও শুভক্ষণে শিশুকে স্নান করাইয়া নিমন্ত্রিত অতিথিদিগের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। এই উপলক্ষে শিশু নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর দ্রব্য উপহার পায় এবং অতিথিদিগকে চা ও চুরুট দিয়া অভ্যর্থনা করা হয়। এই দেশের ছেলেরা অতি অল্পবয়স হইতেই ভাত খাইতে শিখে, কারণ মাতৃ-স্তন্য-দুগ্ধ ছাড়া অন্য দুগ্ধ পান করিতে ইহারা ভালবাসে না। ইহারা কোষ্ঠীতে খুব বিশ্বাস করে এবং শিশুর কোষ্ঠী তৈয়ার করাইয়া তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের কথা জানিবার চেষ্টা করে। ব্রহ্মে কোনও কোনও লোক বয়স হইলে ছেলেবেলার নাম পরিবর্ত্তন করেন। তখন তাঁহার কোনও বন্ধু বাড়ী বাড়ী এক প্যাকেট চা উপহার দিয়া বলিয়া আসেন যে, আজ হইতে অমুককে অমুক নামে ডাকিবেন।

আগে সাপ, পরী, দৈত্য, দানা, ভূত, প্রেত প্রভৃতির ভয়ে ইহারা অল্পবয়সেই দেহে নানা প্রকার উল্কি পরিত। ইহা এত যন্ত্রণাদায়ক ছিল যে, অনেক সময় ছোট ছোট শিশুদিগকে আফিঙ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া উল্কি পরান হইত। অনেক লোকে বিশ্বাস করিত যে, পরীরা কোনও কোনও বৃক্ষে ও ফুলে বাস করে। ইহারা পরীদের বাসের নিমিত্ত অনেক সময় গাছের উপর ছোট ছোট গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিত এবং

এই সকল গাছের নিকট দিয়া যাইবার সময় অতিশয় সন্তর্পণে গমন করিত। পরীদিগকে বিরক্ত করিলে নানা প্রকার বিপদ বা বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস ছিল।

নয়-দশ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েদের কর্ণবেধ হইত। এই উপলক্ষে গৃহে বহু লোক নিমন্ত্রিত হইত। কর্ণবেধ হওয়ার পর মেয়েরা ছেলেদের সহিত আর তেমন ভালভাবে মিশিতে পারিত না। তখন হইতেই তাহারা বয়স্থা কন্যা বলিয়া গণ্য হইত এবং কর্ণে দুল ব্যবহার করিত। কর্ণের ছিদ্রগুলি অনেক সময় এত বড় হইত যে, তাহার মধ্যে বর্ম্মা চুরুট ভরিয়া রাখা যাইত। এখন এসব প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছে।

ব্রহ্মের ছেলেমেয়েরা অতিশয় শান্ত, তাহারা প্রায়ই কাঁদে না, কিংবা রাগারাগি করিয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করে না। মেয়েরা প্রকাশ্যে কখনও হো-হো করিয়া হাসে না; খুব হাসি পাইলেও হাসি চাপিয়া রাখে, কারণ সকলের সাম্‌নে হাসা তাহারা অভদ্রতা মনে করে।

ব্রহ্মের ছেলেরা আমাদের মত খেলাধূলা করে। শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে বল লইয়া এক প্রকারের নূতন রকমের খেলা প্রচলিত আছে; তাহাকে চিংলং খেলা বলে। কতকগুলি লোকে একে একে চারি-পাঁচটি বল লইয়া এক একটি করিয়া উপরে ছুঁড়িয়া মারে। ঐগুলির কোনটি কাঁধে, কোনটি হাতের কব্জির উপর, কোনটি বা পায়ের কব্জির উপর

রাখে; কোনটিই মাটিতে পড়িতে দেয় না। ইহা খুব শক্ত খেলা; যে লোক সর্ব্বাপেক্ষা বেশিক্ষণ বল মাটিতে পড়িতে না দিয়া রাখিতে পারে, খেলায় তাহার জিৎ হয়। ব্রহ্মের লোকেরা এই খেলা দেখাইয়া নানা স্থানে খুব নাম করিয়াছে। ইহারা দড়ি লইয়া আর এক প্রকার খেলা করে। তাহাতেও যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। ইহা ছাড়া ব্রহ্মে নানা প্রকার নাচ প্রচলিত আছে। সকল স্থানেই মধ্যে মধ্যে নাট্যোৎসব বা পোয়ে হয়। নানা রকমের নাচ ব্রহ্মে প্রচলিত আছে, যথা— জ্যা পোয়ে বা জীবন্ত মানুষের নাচ, হরেসিস পোয়ে বা বায়োস্কোপ ইত্যাদি। পল্লীগ্রামেও উৎসবাদিতে পোয়ে নৃত্য হয়। ভদ্রমেয়েরাও প্রকাশ্যে পোয়ে নৃত্যে যোগদান করেন।

ব্রহ্মের অধিকাংশ অধিবাসীই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কথিত আছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ শাক্যবংশীয় জনৈক রাজা এখানে আসেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে। এখনও এই দেশে বহু **প্যাগোডা,** ফায়া বা বৌদ্ধমন্দির আছে। এই সকল মন্দির বা মঠের বৌদ্ধপুরোহিতকে ফুঙ্গি বলে। ফুঙ্গিগণ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। ছোট ছোট ফুঙ্গিদের উপর যে সকল পুরোহিত থাকেন, তাঁহাদিগকে রাহান এবং তাহাদিগের উপরের পুরোহিতদিগকে সরিদগী বলে। কোনও শ্রেষ্ঠ ফুঙ্গির মৃত্যু হইলে তাঁহার সম্মানার্থে নানা দেশ হইতে

লোক আসিয়া তথায় একটি মেলা বসিয়া যায়। এই সময় তাঁহার দেহ মধুর মধ্যে রক্ষিত হয়।

ফুঙ্গিগণ ধর্ম্মচর্চ্চা করেন এবং নিজ নিজ গ্রামের বালকগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আট হইতে বার বৎসরের বালক মাত্রেই শিক্ষার্থী হইয়া মঠে প্রবেশ করিতে পারে। বালকদিগের বিদ্যারম্ভ বা হাতে-খড়ি উপলক্ষে একটি উৎসব হয়। ফুঙ্গিদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষা প্রদত্ত হয় এবং বালকেরা সপ বা মাদুরের উপর বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়ে। বালকেরা এখানে লেখাপড়া করে ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করে, কিন্তু বালিকাগণ মঠের বিদ্যালয়ে বা ফুঙ্গিচঙে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। বালক ও বালিকাদের জন্য আজকাল আধুনিক প্রথায় বহু স্কুল, কলেজ, এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। আজকাল অবস্থাপন্ন বর্ম্মীরা আর ফুঙ্গিচঙে ছেলেদের পড়িতে দেন না। তাঁহারা নব্য ধরনের স্কুল ও কলেজে ছেলেদের পড়িতে দেন। কিন্তু দেশের গরীব লোকেরা ফুঙ্গিচঙে এখনও শিক্ষালাভ করে।

ফুঙ্গিগণ হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র পরিধান করেন, মস্তক মুণ্ডন করেন এবং নগ্নপদে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন। দেশের ও দশের সেবাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত। প্রাথমিক শিক্ষার ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকায় ব্রহ্মদেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ভারতের যে-কোন প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশি।

ইঁহারা প্রত্যহ ভিক্ষাপাত্র হস্তে গ্রামের রাস্তা দিয়া যান। যে কোনও লোক ইচ্ছা করিলে ইঁহাদিগের পাত্রে রান্নাকরা ভাত, তরকারি, ফল-মূল প্রভৃতি দিতে পারে। ইহা হইতে তাঁহাদিগের আহার ও মঠের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। ব্রহ্মের অধিবাসীরা নানাপ্রকার উৎসব ও মহোৎসবের খুব ভক্ত। ইহা হইতেও মঠের কিছু আয় হয়। ব্রহ্মের লোকদের ধর্ম্মে খুব আস্থা আছে এবং প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে একজন করিয়া ফুঙ্গি বা সন্ন্যাসী হইয়া মঠে বাস করেন।

ব্রহ্মের ভাষায় বহু সংস্কৃত ও পালি শব্দের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অক্ষরগুলি ভারতীয় বর্ণমালা হইতে গৃহীত। ব্রহ্মের বর্ণমালায় মোট তেত্রিশটি অক্ষর আছে। এইগুলি দেখিতে অনেকটা সংস্কৃতের মত এবং আমাদেরই মত বর্ণানুসারে সাজান, যথা—কাজি (ক), খাগোরে (খ), গাঙ্গে (গ), গাজি (ঘ) ও ঙা (ঙ)। ইহাদিগের গণিবার প্রথাও আমাদিগের মত। মঠসমূহে তালপত্র ও বাঁশদ্বারা প্রস্তুত কাগজে লিখিত অনেক পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মে বহু সুদক্ষ শিল্পী আছে। এখানে কাঠের উপর সুন্দর সুন্দর ছবি, নক্সা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গৃহনির্ম্মাণ, নৌকা-গঠন প্রভৃতি কার্য্যেও ইহারা দক্ষ। **রেঙ্গুন** শহরের নিকটে স্থাপিত বিখ্যাত শিউদাগোন প্যাগোডা ইহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই মন্দিরটি একটি ছোট পর্ব্বতের উপরে

স্থাপিত বলিয়া ইহার স্বর্ণচূড়া বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কথিত আছে যে, এই মন্দিরে বুদ্ধদেবের মাথার চুল পাঁচ-গাছি রক্ষিত আছে। রাজা আলস্ত্রা ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং রাজা সিসপিউইন কাছাড়, মণিপুর ও শ্যাম বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ ইহার চূড়া স্বর্ণ দিয়া বাঁধাইয়া দেন। এখানে ব্রহ্মবাসীরা পত্রপুষ্প দিয়া পূজা দেন এবং রমণীরা অনেক সময় চুল মানত করেন। উত্তর ব্রহ্মের **মান্দালয়** অঞ্চলে এত প্যাগোডা আছে যে, অনেক সময় ইহাকে প্যাগোডা বা মন্দিরের দেশ বলা হয়। একটি মন্দিরে **আকিয়াব** হইতে আনীত একটি বড় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। একটি শায়িত বুদ্ধমূর্ত্তি এত বড় যে, সিঁড়ি লাগাইয়া উহার কাছে যাইতে হয়। **পেগুর** শিউয়জ প্যাগোডা ও **অমরাবতীর** রাজপ্রাসাদও দেখিতে অতি সুন্দর।

ব্রহ্মের অরণ্যসমূহে প্রচুর সেগুন কাষ্ঠ জন্মে। পাহাড় ও বন হইতে বড় বড় কাঠের গুড়ি হাতীতে টানিয়া আনে এবং ঐসকল কাঠ নদীর জলে ভাসাইয়া বন্দরে আনা হয়। ব্রহ্মের বন্দরসমূহ হইতে প্রতি বৎসর অনেক সেগুন কাঠ নানা দেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে চালান হয়। ব্রহ্মে কাঠ এত সস্তা যে, লোকে ইহা দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং রাঁধিবার জন্য কাঠ বা কাঠ হইতে প্রস্তুত কয়লা ব্যবহার করে।

কথিত আছে যে, ব্রহ্মের ইনানজ্ঞিং শহরে প্রথমে কেরোসিন তৈল পাওয়া যায়। ব্রহ্ম ভাষায় ইনানজ্ঞি শব্দের অর্থ কেরোসিন। বর্ত্তমান সময়ে নামটু শহর কেরোসিন তৈলের খনির জন্য প্রসিদ্ধ। এখান হইতে অপরিষ্কৃত তৈল নল দ্বারা সমুদ্র-উপকূলে নীত হয়। তথায় ইহা পরিষ্কার করিয়া পেট্রোল, কেরোসিন, তরল প্যারাফিন (liquid paraffin), মবিল তৈল (mobil oil), জমাট তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এখান হইতে ইহা দেশ-বিদেশে চালান হয়। কেরোসিন তৈল কোম্পানীর মধ্যে ইণ্ডো বার্ম্মা পেট্রোলিয়াম কোং (Indo-Burma Petroleum Co.) এবং বার্ম্মা অয়েল কোং (Burma Oil Company) প্রধান।

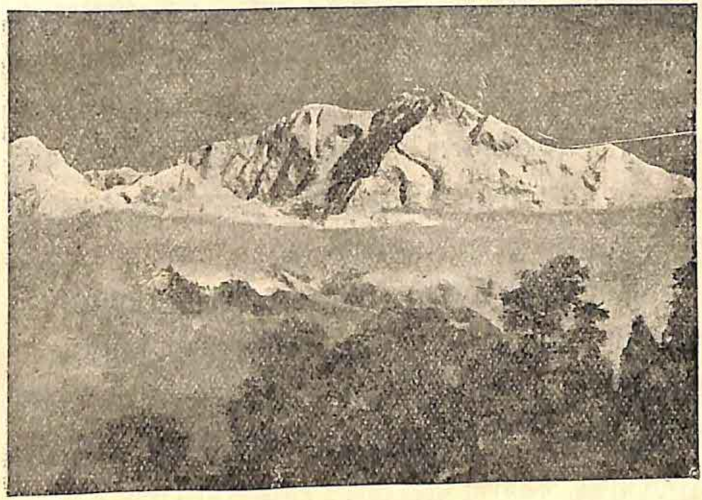
ব্রহ্মে দেখিবার ও শিখিবার জিনিস অনেক আছে। ভারত হইতে ব্রহ্মে যাইতে হইলে স্থলপথে মণিপুর হইয়া যাইতে হয়। এই পথ পর্ব্বতবহুল ও অরণ্যসঙ্কুল। চট্টগ্রাম, কলিকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি বন্দর হইতে জাহাজে চড়িয়া ব্রহ্মে যাওয়া যাইতে পারে। এই পথ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সুগম।

ভারতবর্ষ ও তাহার ছেলেমেয়ে

এশিয়ার দক্ষিণ অংশে ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। বর্ত্তমানে এই দেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। এখানে পৃথিবীর প্রায় একষষ্ঠাংশ লোক বাস করে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা শিক্ষায় ও সভ্যতায় অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কথিত আছে, অতি প্রাচীনকালে রাজা মনু এই দেশ শাসন করিতেন ও প্রজাদিগের ভরণ করিতেন। এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে ভারতবর্ষ। কেহ কেহ বলেন যে, দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে ভারতবর্ষ। জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ভরতকে এই রাজ্য দেওয়ায় ইহার নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে—ইহাও কোনও কোনও পণ্ডিতের মত। ভারতবর্ষের অপর একটি নাম হিন্দুস্থান, সংস্কৃত সিন্ধু শব্দ বঙ্গ ভাষায় হিন্দু হইয়াছে; প্রাচীন গ্রীকেরা এই দেশকে হিন্দোল বা ইন্দিকোষ বলিতেন।

সে আজ অনেক যুগের কথা যখন এই দেশের অস্তিত্বই ছিল না। পণ্ডিতেরা বলেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সর্ব্বোচ পর্ব্বত হিমালয় পর্য্যন্ত সমুদ্রে নিমগ্ন ছিল। নানা প্রকার প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীতে অহরহঃ ভাঙাগড়া চলিতেছে। মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে যেখানে জনবহুল সম্পদশালী দেশ ছিল, আজ হয়ত তাহার অস্তিত্ব

পর্য্যন্ত নাই—কিংবা তাহা শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া কবি গাহিয়াছেন—"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" ইত্যাদি। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বড় বড় নদীর



হিমালয়

পলিমাটির দ্বারা উত্তর ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাংলাদেশ রচিত হইয়াছে। এই জন্য আমাদের দেশে প্রচুর শস্য জন্মে এবং অনেকে ইহাকে স্বর্ণপ্রসূ বলেন। বর্ত্তমানে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের এবং এক-তৃতীয়াংশ ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ভারতের উত্তরে অভ্রভেদী বিশাল হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বদা তুষারাবৃত; পশ্চিমে হিন্দুকুশ প্রভৃতি পর্ব্বত এবং পূর্ব্বে লুসাই পাহাড়, আরাকানইয়োমা ও টেনিসারিমইয়োমা প্রাচীরস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া আছে। ভারতবর্ষের পর্ব্বতগুলি এইরূপ ভাবে সাজান যে, হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্টকে ইহার মস্তক এবং অন্যান্য পর্ব্বতগুলিকে ইহার বাহু বলা যাইতে পারে। ভারতের দক্ষিণে ভারতমহাসাগর। এইরূপে প্রকৃতির কৃপায় কেবল যে এই দেশ সুরক্ষিত হইয়াছে তাহাই নহে, এই সকল পর্ব্বত ও সমুদ্র নানা প্রকারে ইহার জলবায়ুর সমতা রক্ষা করিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রধানতঃ দুইটি ভাগ—আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য। আর্য্যেরা প্রথমে হিমালয়ের দক্ষিণে ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরাংশের দেশসমূহে উপনিবেশ স্থাপন করেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে আর্য্যাবর্ত্ত। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত যে বিস্তীর্ণ মালভূমি আছে, তাহাকে দাক্ষিণাত্য বলে। কথিত আছে যে, আর্য্যদিগের মধ্যে অগস্ত্য মুনি প্রথমে এই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

ভারতে প্রায় ৩৬ কোটি লোকের বাস। ইহার অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। এই দেশে ধান, গম, পাট, তূলা, চা, তামাক, রবিশস্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আমাদের দেশ হইতে পাটজাত দ্রব্য, চা, গম, কয়লা প্রভৃতি বিদেশে চালান হয়

এবং আমরা বিদেশ হইতে নানাবিধ কল, ঔষধ ইত্যাদি ক্রয় করি। ভারতে কয়লা, লৌহ, তাম্র, কেরোসিন তৈল, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। অরণ্যজাত দ্রব্যের মধ্যে বাহাদুরি কাষ্ঠই প্রধান। ইহার দ্বারা আমরা গৃহাদি নির্ম্মাণ করি এবং টেবিল, চেয়ার, নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করি। এই সকল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভারতের অধিকাংশ লোক অতিশয় দরিদ্র। ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য ও খনিজ সম্পদাদি হইতে আমরা এখনও আমাদের প্রয়োজনীয় নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারি না, কাজেই আমাদিগকে অনেক বিষয়ে পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রলিপি, তালপত্র ও কাগজে লিখিত দলিল, পুঁথি প্রভৃতি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই লেখাপড়ার চর্চ্চা হইতেছে। পুরাকালে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা, কলাবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনুশীলন করিতেন। ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসিগণ প্রাচীনকালে মুখে মুখে কিংবা হস্তলিখিত পুঁথির সাহায্যে টোল, পাঠশালা ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতিতে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষা প্রধানতঃ মাতৃভাষার সাহায্যেই হইত। মুসলমান বাদশাহগণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় বিশেষ উৎসাহ দিতেন, সুতরাং ইতিহাস-লিখন-পদ্ধতিরও বিশেষ উন্নতি হয়।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে গবর্ণমেণ্ট কোনও কোনও স্থানে মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে **কলিকাতা, বোম্বাই** ও **মাদ্রাজে** বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হইতেই এই দেশে নানা স্থানে স্কুল, কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হইতে থাকে। কিন্তু অতীব দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে, প্রায় একশত বৎসরের চেষ্টার ফলে ইংরাজ আমলে ভারতের শতকরা মাত্র সাতজন লিখিতে ও পড়িতে পারিত ও হাজারকরা মাত্র আটজন ইংরাজী জানিত। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এত অল্প ছিল যে, মাত্র শতকরা একজন লিখিতে ও পড়িতে পারিত। সমগ্র ভারতবর্ষের কলেজসমূহে প্রায় ৯০,০০০ ছাত্র ও ছাত্রী পড়িত। কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ১½ ছিল। মধ্য ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রায় ১৮ লক্ষ ছাত্র ও ছাত্রী পড়িত। তন্মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা আট হইতে নয়জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০ লক্ষ ছাত্র ও দশ লক্ষ ছাত্রী পড়িত। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার অনুপাতে অতি অল্প সংখ্যক বালক ও বালিকা স্কুল ও কলেজে পাঠ করিত। স্বাধীনতা লাভের পর এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ভারত সরকার সার্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

লেখাপড়া না জানিলেও ভারতের জনসাধারণ পুরাণ,

ধর্ম্মশাস্ত্র, লোকসাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ-গান, কীর্ত্তন, মাণিকপীরের গান, কোরানশরিফ পাঠ, ধর্ম্মপ্রচারকদিগের বক্তৃতা প্রভৃতি হইতে নানা প্রকার জ্ঞান সঞ্চয় করে। বস্তুতঃ এই সকল বিষয়ে তাহাদিগের জ্ঞান অন্যান্য দেশের সাধারণ লোকের অপেক্ষা অনেক বেশি। ভারতের অধিকাংশ লোক শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ। তাহাদিগের মধ্যে শঠতার লেশমাত্র নাই।

ভারতে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। প্রাচীন-কালের স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ স্থানে স্থানে প্রাচীন মন্দির, মস্‌জিদ বা মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মবিষয়ে ভারতবাসী অত্যন্ত গোঁড়া। অধিকাংশ লোকে আপন আপন ধর্ম্মে এতদূর বিশ্বাস করে যে, আবশ্যক হইলে ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সাধারণ লোক ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস করে। ইংরেজ আমলে খৃষ্টীয় প্রচারক-গণের চেষ্টায় অনেক লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদিগের নিমিত্ত স্থানে স্থানে গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতে বহু ভাষা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে বাংলা, হিন্দি, উর্দ্দু, তামিল, তেলেগু, মারাঠি ও গুজরাটি প্রধান। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রধান প্রধান প্রাদেশিক ভাষায় নানা প্রকার সাময়িক পত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়া লোকশিক্ষার সহায়তা করিতেছে এবং প্রতি বৎসর নানা প্রকার গ্রন্থ এই সকল

ভাষায় রচিত হইতেছে। নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত **হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে** প্রধানতঃ উর্দ্দু ভাষার সাহায্যে সমস্ত বিষয় পড়ান হয় বলিয়া ঐ ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভাষা অতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে। হিন্দি এখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে এবং এই ভাষারও উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষাই সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধ।

ধর্ম্ম, ভাষা, আচার ও ব্যবহারে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে। ইংরেজ আমলে সমগ্র ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই এখন নিজেদের মধ্যে এই ভাষার সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারেন। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র হিন্দি ভাষা অল্পবিস্তর চলে বলিয়া এবং স্বাধীন ভারতে ইহা রাষ্ট্রভাষার সম্মান পাইয়াছে বলিয়া হিন্দি ভাষাভিজ্ঞ লোকের সংখ্যাও দ্রুত বাড়িতেছে। ভারতবাসী রক্ষণশীল জাতি বলিয়া বহুকাল পরাধীন থাকা সত্ত্বেও ভারত তাহার বৈশিষ্ট্য একেবারে হারায় নাই।

অন্যান্য দেশের মত ভারতবাসীরা ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট আদর করে। প্রায় সমস্ত প্রদেশেই কন্যা অপেক্ষা পুত্রের আদর বেশি। পুত্র জন্মিলে মাতাপিতা অতিশয় আনন্দিত হন। অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে পুত্র জন্মিবার পর নানা প্রকার

উৎসবাদি হয়। সাধারণতঃ ছয়মাস বয়সে পুত্রকন্যার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন হয়। এই উপলক্ষে সকলেই আপন আপন অবস্থা অনুসারে গৃহে ভোজের আয়োজন করেন। ছোট ছেলেমেয়েরা একত্রে খেলা করে। পল্লীগ্রামে গরীব বালক-বালিকারা অনেক সময় নগ্নদেহেই থাকে। ইহাতে তাহাদিগের শরীর শীতাতপ সহ্য করিবার উপযুক্ত হইয়া গঠিত হয়। প্রাতে ও বৈকালে ছেলেমেয়েরা গৃহে বা মাঠে খেলা করে। লুকোচুরি, দাঁড়িচা, কাপাটি, দৌড়াদৌড়ি, সাঁতার-কাটা, মার্ব্বেল, ফুটবল, ব্যাটবল, ঘুড়ি উড়ান প্রভৃতি নানা প্রকার খেলা এই দেশে প্রচলিত আছে।

সাধারণতঃ পঞ্চমবর্ষ বয়সে বালক ও বালিকার বিদ্যারম্ভ হয়। তাহারা প্রথমে দেশীয় ভাষায় অক্ষরগুলি চিনিতে ও লিখিতে শিখে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অনেক সময় বৃক্ষের ছায়ায় বা গ্রামের কোনও অবস্থাপন্ন লোকের বৈঠকখানায় বসে। উন্মুক্ত বৃক্ষতলে পাঠ দান ও পাঠ গ্রহণ করায় ছেলেদের মন বেশ প্রফুল্ল থাকে। পাঠশালার ছেলেরা শিক্ষক-সমীপে আসন করিয়া বসিয়া পাঠ গ্রহণ করে। হস্তলিপি শিখিবার জন্য প্রথমে স্কুলের মেঝেয় বা আঙিনায় খড়ি দিয়া লিখে; তাহার পর তালপাতা বা শ্লেটের উপর লিখিতে শিখে। ছেলেরা প্রথম হইতে সংখ্যা গণনা করে, নামতা মুখস্থ করে ও অঙ্ক কষে। পল্লীগ্রামের ছোট ছোট

ছেলেরা বড় বড় হিসাব মনে মনে এত শীঘ্র করিয়া দেয় যে, বিদেশের অঙ্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনেক সময় তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যান। ভারতের বালকবালিকারা অতিশয় মেধাবী। বুদ্ধিতে ইহারা অন্য কোনও দেশের ছাত্র বা ছাত্রী অপেক্ষা হীন নহে। প্রাথমিক শিক্ষার পর ছেলেরা মধ্য বা উচ্চ ইংরাজী স্কুলে পড়ে; তাহার পর কলেজে পাঠ করে। কেহ কেহ ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, বয়নবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিবার নিমিত্ত স্কুল বা কলেজে ভর্ত্তি হয়। স্বাধীন ভারতে এই সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে এবং সকল প্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার বিদ্যালয় নানা স্থানে স্থাপিত হইতেছে।

আগে মেয়েরা সাধারণতঃ বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্কুলে পড়িত। এখন অনেক মেয়েই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছে। তবু এখনও ভারতের অধিকাংশ পল্লীতে স্ত্রী-শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত হয় নাই, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও বালিকারা অনেক সময়েই স্কুলে পড়িবার সুযোগ পায় না। তবুও আজকাল ভারতীয় স্ত্রীলোকগণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও নানা দেশহিতকর কার্য্যে যোগদান করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতেছেন।

পারস্যের ছেলেমেয়ে

পারস্য অতি প্রাচীন সুসভ্য দেশ, কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে পারস্যের গৌরব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল; সম্প্রতি প্রাচ্যের অন্যান্য অনেক দেশের মত তথায় নবজাগরণ হইয়াছে। এই প্রাচীন জাতি পুনরায় তাহার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইতেছে।

পারস্যের অধিবাসীরা তাহাদের দেশকে **ইরাণ** রাজ বলে। এই দেশ আকারে বৃহৎ হইলেও ইহার কোন অংশেই আমাদের দেশের মত ঘন বসতি নাই, কারণ ইহা কতক অংশ মরুভূমি ও পর্ব্বতাদিতে পূর্ণ। দাক্ষিণাত্যের ম পারস্যের দক্ষিণদিকে তেমন বৃষ্টি হয় না, কেবল উত্তর কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বেশ বৃষ্টি হয়। সুতরা প্রধানতঃ ইহার উত্তরদিকে গম, যব, ধান, আখ প্রভৃতি চাষ হয়। দক্ষিণদিকেও মরূদ্যানসমূহে খেজুর, কিস্‌মিস বাদাম প্রভৃতি জন্মে। পারস্যের কৃষকেরা মাটির নীচে পয়ঃপ্রণালী দিয়া বহুদূর হইতে জল লইয়া গিয়া জমি সে করে। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে জল উত্তপ্ত হইবে ও শুকাই যাইবে বলিয়া ইহারা মাটির নীচে পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করে গ্রীষ্মাধিক্যের জন্য তথায় অনেকেই রাত্রিকালে খোলা ছাদে

শয়ন করে। নির্ম্মল মেঘশূন্য তারকাখচিত আকাশতলে শয়ন সকলেই পছন্দ করে। শীতের সময় কোনও কোনও পর্ব্বত-চূড়া বরফাবৃত হয় ও পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কখনও কখনও বরফ পড়ে।

বুশায়ার বা বন্দর আব্বাস পারস্যের প্রধান বন্দর। এখান হইতে খেজুর, টাটু ঘোড়া, মুক্তা ইত্যাদি ইউরোপ, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে চালান হয়। এখান হইতে উষ্ট্র বা অশ্বের পৃষ্ঠে কিংবা মোটরে **সিরাজ, ইস্পাহান, তেহারাণ, তাব্রিজ** প্রভৃতি শহরে যাওয়া যায়। তাব্রিজ হইতে কৃষ্ণ-সাগরের তীরবর্ত্তী বাটুম বন্দর পর্য্যন্ত রেলপথ আছে। সুতরাং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশসমূহের সহিত পারস্যের ব্যবসা-বাণিজ্য তাব্রিজ হইতে চলে। সিরাজনগর বিশ্ববিখ্যাত পারসিক কবি **সাদি** ও **হাফেজের** লীলাভূমি। **মেসেদ** নগর সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদিগের তীর্থস্থান। এখানে হারুণ-অল-রসিদের সমাধি আছে।

নানা প্রকার শিল্পকার্য্যে ইরাণীরা পটু। তাহারা ছাগ ও উটের লোম হইতে শাল, কার্পেট প্রভৃতি প্রস্তুত করে। সুগন্ধি দ্রব্য, তামা ও পিতলের নানা প্রকার দ্রব্য, সুন্দর সুন্দর তরবারি প্রভৃতি তথায় প্রস্তুত হয়।

পারস্যের সমস্ত লোক স্থায়িভাবে ঘরবাড়ী করিয়া বাস করে না। তথায় বহু 'যাযাবর' বা ভ্রমণকারী দল আছে।

উহাদিগকে ইলিয়াত বলে। আর যাহারা গ্রামে বা শহরে ঘরবাড়ী করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করে, তাহাদিগকে সেহেরিজ



পারস্যের কার্পেট-বিক্রেতা

বলে। ইহাদিগের মধ্যে আবার তৌজিক, সির্জ্জা প্রভৃতি নানা প্রকার ভাগ আছে। মোটের উপর পারস্যের অধিবাসীরা

দেখিতে সুন্দর ; খুব লম্বাচওড়া জোয়ান তথায় বেশি দেখা না গেলেও অধিকাংশ লোকই সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবান। বামন সে দেশে প্রায় নাই বলিলেই হয়। ইহারা বেশ ভদ্র, পরিশ্রমী ও সাহসী, কিন্তু লোভী ও অমিতব্যয়ী। এখানে সিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের মুসলমানই আছে। ইহা ছাড়া ইহুদী, আর্ম্মেনিয়ান প্রভৃতি জাতিও পারস্যে বাস করে। পারস্যের বহু লোক সুফি ধর্ম্মমত পোষণ করে, কিন্তু কেহ ইহাদের প্রতি কোনও অত্যাচার করে না। অগ্নি-উপাসক বা জরথ্রীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা কম। পুরোহিত বা মোল্লা শ্রেণীর মধ্যে নানা বিভাগ আছে ; সকলের সম্মান, বৈভব ও প্রতিপত্তি এক রকমের নহে। ইহাদিগের মধ্যে ভাল মন্দ সকল রকমের লোকই আছে। মোটের উপর এদেশে মোল্লাদিগের খুব খাতির।

আমাদের দেশের মত পারস্যে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের আদর বেশি। বাটীতে পুত্র সন্তান হইলে মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই খুব আনন্দ করেন ; সুন্দর সুন্দর জামা, খেলনা, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি লইয়া বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-কুটুম্ব সকলে ছেলে দেখিতে আসেন। কিন্তু মায়ের মন এমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে, কেহ ছেলের সুন্দর স্বাস্থ্য বা চেহারার প্রশংসা করিলে মা মনে করেন যে, কোনও অপদেবতা বা ডাইনি বুড়ী বুঝি বা ছেলের অনিষ্ট করিবে! সুতরাং “খোকার চোখ দুটি কি

সুন্দর; হাত দুখানি কেমন নরম” ইত্যাদি বলিয়া কেহ প্রশংসা করিলে মা অমনি বলিয়া উঠেন, “বেঁচে থাক বাছা, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের অনুগ্রহ।”

ছেলে একটু বড় হইলেই তাহার নামকরণ-উৎসব উপলক্ষে বাটীতে আমোদ-আহ্লাদ ও ভোজ হয়। আমাদের দেশের



পারস্যের একটি স্কুল

(একটি ছেলেকে কিরূপে সাজা দেওয়া হইতেছে তাহা লক্ষ্য কর)

মতই সেখানেও পুরুত বা মোল্লা ছাড়া কোন কিছু হওয়ার উপায় নাই। মোল্লাজি আসিয়া ছেলের ডান ও বাম কর্ণে তিন বার করিয়া তাহার নাম শুনাইয়া দেন। খোকা বড় হইলে ভাই-বোনদের সহিত খেলা করে। তারপর আমাদের মতই পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ হয়। এখানেও মোল্লাজি

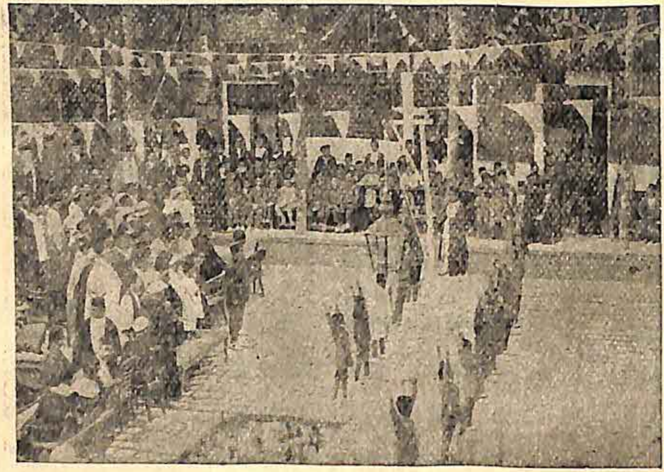
ছাড়া উপায় নাই, কারণ একাধারে তাঁহারাই সে-দেশের পুরোহিত ও লোকশিক্ষক। ছেলেরা মাদুর বা কোন আসনের উপর বসিয়া মোল্লা বা শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করে। প্রথমেই তাহারা আরবি পড়িতে শিখে। আরবি হরফ বাংলার মত সোজা নহে, কাজেই ঐগুলি শিখিতেই অনেক দিন কাটিয়া যায়। অক্ষর চেনা হইলেই আরম্ভ হয় তোতাপাখীর মত কোরানশরিফ মুখস্থ করা। ছোট ছোট ছেলেরা কোরান মুখস্থ করে, কিন্তু তাহারা তখন উহার মানে আদৌ বুঝে না, সুতরাং ইহাও এক কঠিন ব্যাপার। এইরূপে পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যে কোরান কণ্ঠস্থ হইলে প্রাথমিক পাঠ শেষ হয় ও এই উপলক্ষে একটা উৎসব হয়। ইহার পর তাহারা ইচ্ছানুসারে দেশীয় ভাষা, আইন প্রভৃতির চর্চ্চা করে।

পারস্যের ইস্পাহান, সিরাজ ও মেসেদ নগরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইস্পাহান আমাদের দেশের নবদ্বীপ বা কাশীর মত শিক্ষার কেন্দ্র। তথায় অনেকগুলি বড় বড় কলেজ আছে। অন্যূন আট-দশ হাজার ছাত্র ইস্পাহান বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিদ্যার চর্চ্চা করে। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ আরবি ও পারসি সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, আইন, কোরানের টীকা, ব্যবস্থা ইত্যাদি পড়ান হয়। পারস্যরাজ আব্বাসের সময় হইতে ইস্পাহান একটি বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছে ও পারস্যের সকল প্রদেশ হইতে ছাত্রেরা এখানে অধ্যয়ন করিতে

আসে। প্রত্যেক কলেজে একজন অধ্যক্ষ আছেন। প্রত্যেক কাজই নিয়ম ও শৃঙ্খলা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। কোন কোন কলেজের অনেক ভূসম্পত্তি ও অন্যান্য আয় আছে। যে-কেহ ইচ্ছা করিলে অধ্যাপকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে পারে। অধ্যাপকেরা ছাত্রদের নিকট পাঠ বিক্রয় করেন না; তাঁহারা কেবল যশঃ ও সম্মানের প্রার্থী। অতি দরিদ্র বা যাযাবর-শ্রেণীর লোক ব্যতীত সকল বালকই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির দোষে বেশি কিছু শিখিতে পারে না। পারস্যে জ্যোতিষ, বীজগণিত ইত্যাদির অল্প অল্প চর্চ্চা হয়, কিন্তু সাধারণতঃ এদেশের ছেলেরা অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতি বড় একটা শিখে না। আজকাল এই সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে ও আধুনিক ধরনের স্কুল, কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে। স্থানে স্থানে মিশনারি ও মৌলবিরা স্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

মেয়েরা পাঁচ-সাত বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে একত্রে খেলাধূলা করে। ইমাম ও মোল্লারা স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী হইলেও পারস্যে উত্তরোত্তর স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার হইতেছে। কারণ সে-দেশের লোকে জানে যে, মহম্মদ স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে, বিশেষতঃ কোরান পাঠ করিতে আদেশ দিয়াছেন। মেয়েরাও বালকদিগের মত কোরান পড়িতে শিখে। বার-তের বৎসর বয়সে তাহারা

হারেম বা অন্দরমহলে প্রবেশ করে। তথায় তাহারা সূচীশিল্প, নানাবিধ সরবৎ প্রস্তুত ও রান্নার কাজ শিক্ষা করে। সাধারণতঃ বার বৎসর বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হয়। মেয়েদের বিবাহ মাতাপিতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেও আজকাল ইহার



পারস্যের নব্যধরনের একটি স্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভা

ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোকদের মধ্যে পর্দ্দা-প্রথার খুব আঁটা-আঁটি। তবে গরীবের ঘরের মেয়েরা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পথে ঘাটে বাহির হয়; বড়লোকের মেয়েরা সাধারণতঃ বাড়ীর বাহির হইবার সময় আপাদমস্তক লম্বা আলখাল্লা বা বোর্খায় আবৃত করিয়া বাহির হন; কেবল

চোখ দুইটির সাম্‌নে সূক্ষ্ম জাল দেওয়া থাকে, তাহা দ্বারা রাস্তাঘাট দেখিতে পান। এইরূপে বোর্‌খা-আবৃত হইয়া আবশ্যকমত তাঁহারা পদব্রজে ও গাধায় চড়িয়া যাতায়াত করেন। তখন তাঁহাদের পায়ের জুতা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা জুতা বাহিরে রাখিয়া যান; তারপর ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলেন, "ভগবান আপনাদের শান্তি দিউন।" অমনি গৃহকর্ত্রীরা বলেন, "আসুন, আসুন, কতদিন দেখি নাই, আপনার আসনখানি খালি প'ড়ে আছে।" অতিথি উত্তর করেন, "আপনাদের সব খবর ভাল তো? ভগবানের ইচ্ছায় আপনাদের নাকগুলি বেশ মোটা হউক।" সব অঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া নাকগুলি মোটা হওয়ার ইচ্ছা জানান আশ্চর্য্য হইলেও ইহাই সেখানকার ভদ্রতা। আসন গ্রহণের পর অতিথি বোর্‌খা খুলিয়া ফেলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর গড়গড়া বা ফরসিতে তামাক এবং চা, সরবৎ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিয়া অতিথির অভ্যর্থনা করা হয়। পারস্যের অধিবাসীরা সকলেই, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েরা মিষ্টান্নের খুব ভক্ত। তাঁহারা যে চা পান করেন, তাহাতে চা অতি অল্পই থাকে, উহা একরূপ গরম সরবৎ মাত্র।

আরব ও তাহার ছেলেমেয়ে

এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তে আরবদেশ। উহা আকারে প্রায় ভারতবর্ষের সমান; কিন্তু উহার লোকসংখ্যা খুব কম। সমগ্র আরবের লোকসংখ্যা কলিকাতা ও বোম্বাই শহরের লোক-সংখ্যার চেয়ে বেশি নহে; কারণ উহার প্রায় তিন অংশের এক অংশ জন-বিরল মরুভূমি। আর যেখানে মরুভূমি নাই, সেই সকল স্থানেও গাছপালা খুব কম। উহার উপর দিয়া মৌসুম বায়ু প্রবাহিত হয় না, কাজেই বৃষ্টি হয় না বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের মত সেখানে খাল, বিল, নদী প্রভৃতি একরূপ নাই, সেখানকার বাতাসে আর্দ্রতাও খুব কম। দক্ষিণ আরবের কোনও কোনও স্থান, বিশেষতঃ ওমান উপসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গরম। মরুভূমিতে দিনে খুব গরম, কিন্তু রাত্রিতে ঠাণ্ডা।

আরব দেশের অধিবাসীরা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। উহারা সাহসী, বীর ও কর্ম্মঠ। উহাদিগকে সাধারণতঃ বেদুইন বা মরুদেশের অধিবাসী বলা হয়। উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, দুম্বা প্রভৃতি প্রতিপালন করা উহাদের প্রধান অবলম্বন। ঘাসের জন্য উহারা অনেকে এক স্থানে বাস করে না। কৃষিকার্য্য খুব কম, কেবল মরূদ্যান বা জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে যথেষ্ট খেজুরগাছ জন্মে। খেজুরই উহাদের প্রধান খাদ্য। খেজুর শুকাইয়া সিদ্ধ করিয়া ও তাহা হইতে

নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া উহারা আহার করে। খেজুর উহাদের এত প্রিয় খাদ্য যে, যে দেশে খেজুর নাই—সেখানে যে লোক বাস করিতে পারে, তাহা আরবের সাধারণ লোকে ধারণাই করিতে পারে না। পারস্য, আরব প্রভৃতি দেশ হইতে আমাদের দেশে খেজুরের চালান আসে। এই সকল খেজুর আমাদের দেশের খেজুর অপেক্ষা বহুগুণে রসাল ও মিষ্ট।

বহু মুসলমান তীর্থযাত্রী প্রতি বৎসর হজ করিবার জন্য ইদের পূর্ব্বে **মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা** ও তাঁহার গোরস্থান **মদিনায়** গমন করেন। ভারতীয় মুসলমান যাত্রীরা কলিকাতা, বোম্বাই বা করাচি নগরে জাহাজে চড়িয়া, **এডেন** হইয়া লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী **জেড্ডা** বন্দরে অবতরণ করেন; সেখান হইতে উট বা মোটরে চড়িয়া মক্কা যান। আজকাল যদিও মরুভূমিতে যাতায়াতের জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে মোটর ব্যবহৃত হইতেছে, তথাপি বহু প্রাচীনকাল হইতে উহার জন্য উটের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। এই জন্য ইংরাজীতে উটকে 'Ship of the desert' বলে। উট খুব গরম সহ্য করিতে পারে ও জল পান না করিয়া বহুদূর যাইতে পারে। মরুভূমিতে এক এক সময় ভীষণ ঝড় উপস্থিত হয়। তখন এত বালুকা উড়িতে থাকে যে, বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে জীবন ধারণ করাই কষ্টকর হইয়া পড়ে। সেই সময় উটগুলি নাকের

ছিদ্রে পাতলা চামড়ার পর্দ্দা দিয়া ও বালিতে মুখ গুঁজিয়া আত্মরক্ষা করে। যাত্রীরাও উপুড় হইয়া মুখ নীচু করিয়া পড়িয়া থাকে। আরবেরা উটের দুধ ও মাংস খায় এবং উহার লোম ও চামড়া দিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করে।

কোন সম্ভ্রান্ত সেখ বা আরবি ভদ্রলোককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "আপনার কয় সন্তান?"—তাহা হইলে, তিনি পুত্র কয়টি তাহাই বলিবেন। মেয়েরা একরূপ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কন্যার আদর পুত্রের অপেক্ষা কম হইলেও অল্পবয়সে ছেলেমেয়ে সকলে একসঙ্গে খেলা করে। গরম দেশ—কাজেই বয়স বেশি না হইলে উহারা সর্ব্বদা কাপড় পরে না, খোলা গায়ে রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়। তাহাতে উহাদের শরীর দেশের আবহাওয়ার উপযুক্ত হইয়া গঠিত হয়। খেলনা উহাদের বড় বেশি নাই, তবে উহারা কাদামাটি দিয়া কখনও কখনও নানা প্রকার খেলনা প্রস্তুত করে; খেজুর ও অন্যান্য গাছের পাতা দিয়া অনেক রকম বাঁশি প্রস্তুত করে। আরবেরা খুব ঘোড়ায় চড়িতে পারে; আরবি অশ্ব দেখিতে খুব সুন্দর। পিতার দেখাদেখি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘোড়া ঘোড়া খেলা করিতে বড় ভালবাসে। চাঁদনি রাত্রিতে উহারা প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ বা তাঁবুর পার্শ্বে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। আরবে ছেলে-মেয়েরা বালি বা মাটির উপর ঘর আঁকিয়া ইট বা পাথরের গুটিদ্বারা নানা প্রকার খেলা করে। তাহারা দাবা খেলা

অতিশয় পছন্দ করে। মেলা বা উৎসব উপলক্ষে, ছেলেরা নাগর-দোলায় চড়িয়া ঘুরিতে বড় ভালবাসে।

শিশুর জন্মের সাতদিন পরে তাহার নামকরণ-উৎসব হয়। এই সময় আত্মীয়, কুটুম্ব, মোল্লা প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হন। এই উপলক্ষে একটি ভোজ হয়। উহাতে আহারের নিমিত্ত ভেড়া বা ছাগলের মাংসের কাবাব, খেজুর, ডুমুর প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত নানাবিধ খাদ্য ও মধু দেওয়া হয়। উহারা ভূতপ্রেতাদিতে বিশ্বাস করে, কাজেই কোন ডাইনি বুড়ী বা ভূতপ্রেত যাহাতে কোনও শিশুর অনিষ্ট করিতে না পারে, এইজন্য তাহার ধর্ম্ম-মা এই সময়ে শিশুর হাতে বালা পরাইয়া দেন। একটু বড় হইলে শহরের ছেলেরা আরবি অক্ষর চিনিতে শিখে। প্রথমে একখানি কাঠের তক্তার উপর উহারা অক্ষরগুলি পুনঃপুনঃ লিখে; পরে কোরানের কোনও অংশ উহাতে নকল করে। পারস্যের ন্যায় আরবদেশের ছেলেরাও কোরান কণ্ঠস্থ করে। পাঠদানকালে কিছু লিখিবার আবশ্যক হইলে শিক্ষক মহাশয় তাহা বালির উপর লিখিয়া দেন, বোর্ডের আবশ্যক হয় না। পল্লীগ্রাম বা সুদূর মরুপ্রান্তরের ছেলেরা অধিকাংশই অশিক্ষিত। তাহারা পশুপালন, কফিপ্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা করে। আরবেরা অতিশয় অতিথি-পরায়ণ। গৃহস্বামী বাড়ীতে না থাকিলে আরব বালকেরাই অতিথিদিগকে কফি দিয়া অভ্যর্থনা করে।

মেয়েরা দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাহিরে বেড়ায়, কিন্তু তাহার পর তাহারা হারেম বা অন্দরে প্রবেশ করে। উহার পর



আরব শিশু ও তাহার মাতা

বাহির হইতে হইলে বোর্‌খা পরিয়া বাহির হয়। কিন্তু আরবে পর্দ্দা-প্রথা তত বেশি প্রবল নহে, কারণ অনেক সময়ে আরব-রমণীরা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন—তাহার

দৃষ্টান্ত আরবের ইতিহাসে পাওয়া যায়। গরীবঘরের মেয়েরা চরখা কাটা, রান্না করা, সূচীকার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা করে; আর বড়লোকের মেয়েরা নাচ, গানবাজনা, রুটি ও খাবার প্রভৃতি নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে। সাধারণতঃ বার বৎসর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়। উৎসবের



আরবদিগের কফি খাইবার দৃশ্য

সময় উহারা রঙিন পোষাক ও নানা অলঙ্কার পরে। আরব গৃহিণী মরুভূমি পার হইবার সময় স্বচ্ছন্দে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদিগকে লইয়া উটে চড়েন; তখন আর মুখে ঘোমটা থাকে না। মেয়েরা শুক্রবারে গোরস্থানে বেড়াইতে যান। সেখানে পরস্পরের মধ্যে দেখাশুনা, গল্পগুজব প্রভৃতি হয়। হাল-

ফ্যাসানের মেয়েদের মত সচরাচর তাঁহারা সুগন্ধি দ্রব্য, আয়না প্রভৃতি ব্যবহার করেন না, অন্য পুরুষ বাড়ীতে আসিলে সরিয়া যান ; কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অনেক সময় পর্দ্দা, তাঁবুর ঘুলঘুলি বা ছিদ্র দিয়া, কি হইতেছে তাহা দেখেন।

সুদূর পল্লীগ্রামে পয়সাকড়ির প্রচলন একরূপ নাই বলিলেই চলে। প্রজারা সেখজিকে খাজনা-স্বরূপ অবস্থানুসারে একবস্তা খেজুর, একটি উটের বাচ্চা, ছয়টি ভেড়া প্রভৃতি দেন। যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারা চোর-ডাকাতের ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। কাজেই অনেকেই টাকাকড়ি ও মূল্যবান দ্রব্য মাটিতে পুঁতিয়া রাখেন। পল্লীগ্রামে বিনিময়ের জন্য লোকে জিনিস-পত্রই বেশি ব্যবহার করে।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে আরবেরা গৃহস্থালীর সমস্ত জিনিস উটের পিঠে চাপাইয়া চলিয়া যান। মরুভূমি পার হইবার সময় মশকে জল ভরিয়া লওয়া হয়। দৈবাৎ যদি মশকের চামড়া ছিঁড়িয়া জল পড়িয়া যায়, তাহা হইলে পিপাসায় সকলকে মারা যাইতে হয়। এইরূপে উটে চড়িয়া দিনের পর দিন মরুভূমির উপর দিয়া যাইতে যাইতে যখন তাঁহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন, তখন হঠাৎ একদিন হরিৎক্ষেত্র ও জলাশয় দেখিয়া তাঁহারা কিরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

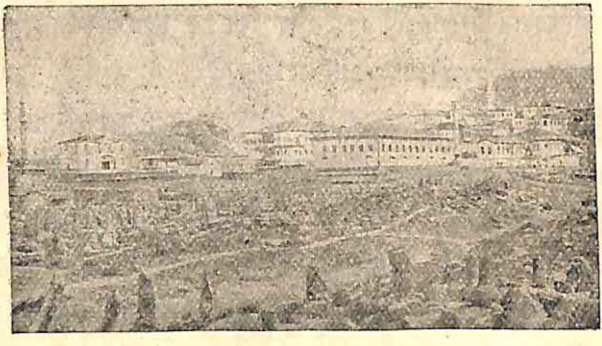
তুরস্ক ও তাহার ছেলেমেয়ে

তুরস্ক অতি প্রাচীন দেশ। এক সময়ে ইহা মধ্য-ইউরোপ হইতে মধ্য-এশিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর এই রাজ্যের সীমা ও শাসন-প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এশিয়ার মধ্যে এশিয়া-মাইনর, আনাটোলিয়া ও কুর্দ্দীস্থান এবং ইউরোপের কনষ্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুলের নিকটবর্ত্তী সামান্য কয়েক মাইল স্থান লইয়া এই রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কের নবজাগরণ ঘটিয়াছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই দেশে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তুরস্কের সুলতানগণ এককালে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্ ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ইঁহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া খলিফাপদে আসীন থাকিয়া ইসলামধর্ম্ম-জগতে নেতৃত্ব করিয়াছেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান রাজ্যচ্যুত হয়েন এবং খলিফাপদ লোপ পায়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে কামাল পাশা সাধারণতন্ত্রের কর্ণধাররূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেলাল বায়ার তুরস্কের রাষ্ট্রপতি।

তুরস্কে এখন আইনগুলি বিধিবদ্ধ হইয়া আদালতের সংস্কার হইয়াছে। এখন এই দেশে সাধারণ পুলিশ-আদালত, জেলা-কোর্ট, গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য পৃথক্ কোর্ট ও হাইকোর্ট এই কয়েক প্রকার আদালত আছে।

তুরস্কে পূর্ব্বে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ৪½। বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সকল লোকই শিক্ষিত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে আরবি অক্ষর চিনিতে ও লিখিতে ছেলেদের কষ্ট হইত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আরবি অক্ষরের স্থানে ল্যাটিন অক্ষর প্রচলিত হওয়ায় শিক্ষার



আংকোরা

আরও প্রসার হইয়াছে। ল্যাটিন অক্ষর শিক্ষার সুবিধা এই যে, পুনঃপুনঃ অক্ষর পরিচয় না করিয়া একবার অক্ষর পরিচয় হইলে ইহার সাহায্যে বহু ভাষা বিশেষতঃ ইউরোপের প্রায় সমস্ত ভাষা পাঠ করা যাইতে পারে।

কনষ্টাণ্টিনোপল ও আংকোরায় উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কনষ্টান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি বিভাগ আছে;

যথা—সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আইন ও ধর্ম্ম। ইহা ছাড়া নানা স্থানে টেক্‌নিক্যাল ও আর্ট স্কুল আছে।

নবীন তুর্কি এখন ফেজ টুপি, পাগড়ি প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্ত্য ধরনের পোষাক পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।



কনষ্টান্টিনোপল শহরের একটি রাজপথ

তুর্কি স্ত্রীলোকেরাও পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহারাও নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কার দূর করিয়াছেন। এখন আর তুরস্কে পর্দ্দা-প্রথা নাই বলিলেই হয়।

এখন প্রতি বৎসর নূতন নূতন রাস্তা ও রেলপথ নির্ম্মিত

হইয়া যাতায়াতের অতিশয় সুবিধা হইয়াছে। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে ও প্রজাসমূহের আর্থিক অবস্থারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

যে মহাপুরুষ সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে তুরস্কের এইরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু না বলিলে তুরস্কের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। নব্য তুরস্কের নেতা **কামাল পাশা** ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে তুরস্কের ভদ্র-সন্তানেরা হাকিম বা চিকিৎসক এবং মোল্লা বা পুরোহিতের ব্যবসায় পছন্দ করিতেন। গতানুগতিক ভাবে মোল্লা হইবার উদ্দেশ্যে কামাল পাশাও ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িবার কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈনিকের জীবনের প্রতি তাঁহার প্রাণের টান ছিল। অতএব কিছুদিন পরে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ ত্যাগ করিয়া, তিনি সামরিক কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। সাধারণ সৈনিকের জীবনযাপনের সময় হইতেই তিনি স্বদেশের উন্নতির বিষয় চিন্তা করিতেন। সুলতান আবদুল হামিদের যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ করায় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সুলতানের আদেশক্রমে সিরিয়া দেশে নির্ব্বাসিত হন। তিন বৎসর পর তাঁহাকে ক্ষমা করা হয় এবং তিনি স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি পান। দেশে ফিরিয়া তিনি সেনাপতি-পদে বৃত হন, কিন্তু নবীন তুরস্কের বিপ্লবপন্থী দলের সহিত তাঁহার যোগ থাকে।

ইহার পর ইতালি, বুলগেরিয়া ও রুশ দেশের রণক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া তিনি বহুদর্শিতা লাভ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তুরস্কে নানা প্রকার গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সময় তিনি সৈন্যদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং জাতীয় মহাসভায় সভাপতিরূপে দুইবার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান রাজ্যচ্যুত হইলে সুইজারল্যাণ্ডের আদর্শে তুরস্কে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয় এবং শাসনপ্রণালী, আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ হয়। কামাল পাশার অধিনায়কত্বে দেশে বহু প্রকার উন্নতি হইয়াছে।

তুরস্কের অধিবাসীরা ছেলেমেয়েদিগকে অতিশয় ভালবাসে। শিশু জন্মিবার পরেই তাহাকে স্নান না করাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া দেয়। কেবল মুখটি খোলা থাকে। কারণ সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, শিশুকে উত্তমরূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত না করিলে ভূতপ্রেতাদি তাহার অনিষ্ট করিবে। এইজন্য কখনও কখনও শিশুকে নীল স্ফটিকের মালা, কবচ ও রত্নাদি পরাইয়া দেওয়া হয়। তুর্কিরা শিশুদের জন্য সুন্দর সুন্দর দোলনা প্রস্তুত করে। কাঠের দোলনার উপর অনেক সময় আরবিতে নানা প্রকার কথা লেখা থাকে,—যথা "ভগবানের শীতল ছায়ায় শিশু বিশ্রাম করুক" ইত্যাদি। গরীব লোকেরা দড়ির দোলনায় ছেলেকে ঘুম পাড়ায়।

শিশু জন্মিবার পর তৃতীয় দিনে তাহাকে স্নান করাইয়া

পিতার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। পিতা তখন উচ্চৈঃস্বরে শিশুর কর্ণে তিনবার তাহার নাম বলিয়া দেন। এইরূপে শিশুর নামকরণ হয়। এই উপলক্ষে বাড়ীতে বহু স্ত্রীলোক ও কুটুম্বের সমাগম হয়, কিন্তু কুসংস্কার এমনি প্রবল যে, শিশুর প্রশংসা করিলে পাছে তাহার অমঙ্গল হয় এই ভয়ে সকলেই শিশুর নিন্দা করিয়া থাকেন। শিশু সাধারণতঃ মাতৃস্তন্যই পান করে। বড়লোকের বাড়ীতে কখনও কখনও 'ধাত্রী' বা 'দুধ-মা' রাখা হয়। ছেলেমেয়েদিগকে তুর্কিরা এত ভালবাসে যে, কোনও ছেলের অসুখ করিলে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ছেলেটি আরোগ্যলাভ না করা পর্য্যন্ত রোগীর মত পথ্যাদি ব্যবহার করে। কারণ ছেলেটির অসুস্থ অবস্থায় বাড়ীর অপরাপর লোক ভাল ভাল আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে ছেলেটির মনে কষ্ট হইতে পারে। ছেলেরাও মা-বাপকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। বিনা অনুমতিতে কখনও তাঁহাদিগের সাম্‌নে আসন গ্রহণ করে না বা ধূমপান করে না। তুর্কিরা বড় হইলেও মায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া সমস্ত কার্য্য করে; কারণ তাহারা বলে যে—স্ত্রী মারা গেলে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা যায়, ছেলে মারা গেলে পুনরায় ছেলে হইতে পারে, কিন্তু মাতৃবিয়োগ হইলে আর কখনও মাকে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। এইজন্য সুলতানের শাসনের সময়ে সুলতানের মাতা উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পূর্ব্বে মাতার নিকট হারেম বা অন্দরেই থাকিত। বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর



তুরস্কের ছেলে ও মেয়ে

গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলা হইয়াছে। পূর্ব্বে বার বৎসর বয়সে বা তৎপূর্ব্বে মেয়েদের বিবাহ হইত এবং বিবাহের পর তাহারা পর্দ্দানশীনভাবে বাস করিত। এখন পর্দ্দা-প্রথা উঠিয়া যাওয়ায়

বালক ও বালিকা খেলাধূলা, লেখাপড়া করে। তুরস্কে এখন বহু মেয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এমন কি এরোপ্লেন-ড্রাইভার পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

তুরস্কের স্ত্রীলোকেরা অনেক সময় দল বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হন এবং মাঠে, নদী বা সমুদ্রের তীরে বসিয়া গল্প করেন। সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়েরা তখন তাঁহাদের আশে-পাশে প্রজাপতির মত খেলা করিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও বা সখ করিয়া ইহারা কয়েকজন মিলিয়া একত্রে গরুর গাড়ী চড়িয়া বাড়ী হইতে কিছু দূরে ভ্রমণ করিতে যান। পোলাও, মাছ, মাংস, কিস্‌মিস্, বাদাম প্রভৃতির চাটনি, আঙুর, তরমুজ, ডুমুর প্রভৃতি ফলের সরবত ও কফি ইহাদিগের প্রিয় খাদ্য। ইহারা ছোট ছোট পেয়ালায় বা কাপে কফি পান করেন। একটি কাপে এক ছটাকের বেশি কফি ধরে না। ইহারা আমাদের মত হাত দিয়া আহার করেন বলিয়া আহারের পূর্ব্বে বেশ ভাল করিয়া হাত ধুইয়া লন। এই দেশের অধিকাংশ লোকই ধূমপান করেন।

স্ত্রীলোক, বালক ও বালিকারা গাধায় চড়িয়া বেড়াইতে ভালবাসেন; কখনও কখনও বা 'কেইক' নামক লম্বা নৌকায় চড়িয়া জলবিহার করেন। এই সকল নৌকা প্রায় ২০ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট প্রশস্ত। ইহাতে একটি মাঝি দুইটি দাঁড় টানে।

আমাদের দেশে রবিবারের মত তুরস্কে শুক্রবার ছুটি।

ঐ দিন ছেলেমেয়েরা নানা প্রকার খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ করে। ভালুক নাচ, ভেড়ার লড়াই, মুর্গির লড়াই প্রভৃতি দেখিতে তাহারা অত্যন্ত ভালবাসে। ছেলেরা লাট্টু ঘুরায় এবং অন্য ছেলের লাট্টুর উপর নিজের লাট্টু ফেলিয়া তাহা ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করে। আজকাল তুর্কি বালকেরা ফুটবল, টেনিস, দৌড়, ড্রিল প্রভৃতিতে যোগদান করিতেছে। কুস্তি-লড়াই তুরস্কে খুব প্রচলিত এবং তথায় বহু প্রসিদ্ধ কুস্তিগির বা পালোয়ান আছে। এখানে পুতুল নাচের প্রচলন আছে। ঘোড়দৌড়, ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ, বল্লম নিক্ষেপ প্রভৃতি ইহাদের প্রিয় খেলা। ছেলেরা অনেক সময় বড় বড় লেজওয়ালা ঘুড়ি উড়ায় এবং অনেক সময় ছাদের উপর উঠিয়া ঘুড়ি কাটাকাটি খেলা করে। অনেক ছেলে ও মেয়ে কখনও কখনও মাঠে গোলাকার হইয়া বসে। তাহার পর একে একে হাতের উপর একটি খোলা ছুরি বা চাকু রাখিয়া উহা এইরূপ ভাবে উর্দ্ধে ছুঁড়িয়া দেয় যে, উহা যেন নীচে পড়িয়া মাটিতে বিদ্ধ হয়। জীবজন্তুর হাড় ও পাথর লইয়াও ইহারা নানা প্রকার খেলা করে। অনেক সময় ফাঁদ বা জাল পাতিয়া পাখী ধরে। কোনও কোনও সময়ে এইরূপে দৈনিক বহু পাখী ধরিয়া ফেলে। ছেলেমেয়েরা ঢিল ছুঁড়িতে এত ওস্তাদ যে, তুরস্কের কুকুরেরা যষ্টি অপেক্ষা ঢিলকে বেশি ভয় করে।

কিছুদিন পূর্ব্বে তুর্কিরা স্ত্রী-শিক্ষা আবশ্যক মনে করিত না।

মেয়েরা গৃহকর্ম্ম করিবে, স্বামীর ও ছেলেমেয়ের সেবা করিবে, ইহাই তাহাদিগের মত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বালকদিগের মত প্রত্যেক বালিকাও স্কুলে যাইতে বাধ্য। স্কুল ও কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া অনেক স্ত্রীলোক এখন শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন। পূর্ব্ব প্রথামত বয়স্থা হইলে মেয়ের বিবাহ পিতামাতাই ঠিক করিয়া দেন, এই বিষয়ে মেয়ের মত চলে না।

ছেলেরা প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া আপন আপন বিছানা তুলিয়া রাখে; তাহার পর মুখহাত ধুইয়া প্রাতরাশ স্বরূপ ভাত, পিঠা প্রভৃতি খাইয়া স্কুলে যায়। মধ্যাহ্নে আহারের নিমিত্ত এক ঘণ্টা ছুটি হয়। তখন ফল, ডিম বা কোনও প্রকার লঘুপাক খাদ্য গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্কুলে যায়। সূর্য্যাস্তের পর পরিবারের সকলে মিলিয়া দিবসের প্রধান আহার গ্রহণ করে। সকলে কার্পেট, কম্বল বা সপের উপর আসন করিয়া বসে। একটি নীচু টেবিলের উপর প্রত্যেকের সাম্‌নে একখণ্ড করিয়া রুটি এবং ভাত, তরকারি, মাংস প্রভৃতি থাকে। সকলে উহা হইতে আবশ্যকমত খাদ্য গ্রহণ করে। আহারের পর ছেলেমেয়েরা বিছানা পাতিয়া লেপ গায়ে দিয়া শুইয়া পড়ে। বয়স্ক লোকেরা কিছুক্ষণ ধরিয়া ধূমপান ও গল্পগুজব করে।

সমাপ্ত